সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর

প্রলয় সেন

পত্র-লেখা ॥ প্রকাশন বিভাগ
কলিকাতা-৭০০০৫৪

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ ১৯৬২

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তী
৮৯ নারিকেলডাঙ্গা মেইন রোড
কলিকাতা-৭০০০৫৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীদেবাশীষ দেব

মুদ্রক :
আর, পি, এস
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৬

মামণি-কে

বাবা

লেখকের অন্যান্য বই

ডুবন্ত হার্মাদ

ভুতুড়ে গল্প

অরণ্যের ডাক

অভিশপ্ত চুনার (যন্ত্রস্থ)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিযান কাহিনী

ভয়ঙ্কর দুর্গমের দেশে

ডেভিড হেয়ার

বিবেকানন্দ

নিবেদিতা প্রভৃতি

একবার বেশ কিছুদিনের জন্য সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স বছর চোদ্দ। বেড়াতে নয়, গিয়েছিলাম ছোটকার খোঁজে।

ছোটকা মানে আমার ছোটকাকা নিখোঁজ হয় ডিসেম্বরের শেষদিকে। ওর সন্ধানে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হই তার দিন দশেক বাদে। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল শিয়ালদ' সাউথ ষ্টেশন থেকে। মনে আছে, শীতের শহর তখনো রাতের কালো কাঁথা মুড়ি দিয়ে জবু থবু হয়ে পড়ে আছে। আমরা ট্যাক্সি চেপে ষ্টেশনে পৌঁছই। ক্যানিং ফার্স্ট লোকাল তখন ছাড়ত চারটে পঁচিশে। আমরা ওই ট্রেনটা ধরেছিলাম।

দিন পনের'র মত ছিলাম জলজঙ্গলের রাজত্বে। বিরাট একটা এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রচুর। আজ সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলতে বসেছি তোমাদের।

'সুন্দরবন' শব্দটা শোনামাত্র তোমাদের মনে যে সুন্দর ছবিটা ফুটে ওঠে আসল সুন্দর বনের সঙ্গে তার খুব একটা মিল নেই কিন্তু। শুধু ভারতবর্ষ কেন—সুন্দরবনের মত ভয়াল-দুর্গম অরণ্য সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে। ছোট বড় অজস্র নদীখালে ঘেরা এই বন। 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ' কথাটা বোধহয় একমাত্র সুন্দরবনের বেলাতেই খাটে। শুধু বাঘ-সাপ-বুনোশুয়োর-কুমীর-হাঙর নয়, সেই সঙ্গে এই অরণ্যে খুনে ডাকাতের সংখ্যাও অগুনতি। ফলে, ছোটকার খোঁজ করতে গিয়ে আমরা বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম।

আমরা গিয়েছিলাম তিনজন। অবিনাশকাকা, তপনদা আর আমি। অবিনাশকাকা বাবার বন্ধু। একসময় সেটেলমেন্ট অফিসে কাজ করতেন। সেই সূত্রে সুন্দরবনে কিছুকাল ছিলেন। তপনদা আমার পিসতুতো ভাই। ইতিহাসে এম-এ পাশ করে তখন গবেষণা করছিল। অসম্ভব সাহসী আর বুদ্ধিমান। ছোটকার সমবয়সী।

আমার যাবার কথা ছিল না, ছিল বাবার। বাবার শরীর তখন

ভাল যাচ্ছিল না। একে হার্টের রুগী। তার ওপর সর্দিকাশিতে ভুগছিলেন। বাবার জায়গায় অবিনাশকাকাই আমাকে দলে টেনেছিলেন।

মার্চ মাসে ছোটকা ডুমুরখালি নামে একটা জায়গায় প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি নিয়ে চলে যায়। সুন্দরবনে ওই দিকটায় ডুমুরখালিই শেষ বসতি। তারপর নদী পেরুলেই গভীর বন।

ডুমুরখালি বঙ্গসুন্দরী প্রাইমারি স্কুলের সেক্রেটারি পঞ্চানন মণ্ডলের চিঠি পেয়ে আমরা রওনা হই। বড়দিনের ছুটি শেষ হয়ে গেছে, অথচ ছোটকা ডুমুরখালিতে পৌঁছায় নি—তাই চিঠি দিয়েছিল পঞ্চানন মণ্ডল। চিঠিটা পেয়ে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। পূজোর ছুটিতে শেষবার ছোটকা কলকাতায় এসেছিল। তারপর আর আসে নি। এমন কি ওর কোন চিঠিও পাইনি আমরা।

ভোর ভোর ক্যানিং-এ পৌঁছুলাম। ছোট্ট শহর। উত্তর থেকে দক্ষিণে শহরটাকে ছুঁয়ে মাতলা নদী বয়ে গেছে। তখন সবে চার-দিক কুয়াশায় স্নান করে ঝলমলে হয়ে উঠেছে।

গোসাবার লঞ্চে উঠলাম আমরা। মাথার উপর ভোরের সোনালী আকাশ। দুধারের চরে বকের দল চরে বেড়াচ্ছে। জল কেটে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে লঞ্চ এগিয়ে চলেছে। আনন্দে আমার বুক নেচে উঠল। তখনো জানিনা—আমরা চলেছি এক ভয়ঙ্করের দেশে। যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে বিপদ আর মৃত্যু।

নদীর হাওয়ায় জোর খিদে পেয়ে গিয়েছিল। এগারোটা নাগাদ গোসাবায় এসে পৌঁছুলাম। জায়গাটা বিদ্যা নদীর ধারে গঞ্জমতন। অবিনাশকাকা বললেন, 'চলো, চটপট খেয়ে আসি। বেলাবেলি ডুমুরখালি পৌঁছুতে হবে। অচেনা জায়গা—।

লঞ্চঘাটা থেকে হোটেল কিছুদূরে। খাওয়ার পাট চুকিয়ে নৌকায় এসে উঠলাম। অবিনাশকাকা ছইয়ের ভেতর ঢুকে গেলেন। শীতকাল।

মধ্যদিনের রোদ। বেশ আরাম লাগছিল। নৌকা দক্ষিণ মুখো খালে ঢুকে পড়ল। দুধারে উঁচু পাড়। ধান কাটা হয়ে গেছে। চলছে কলাই আর সরষের চাষ।

'আমার কি মনে হয় জানিস নিরু,'—নস্যির কৌটো বের করে এক-সময় বলল তপনদা, 'বড়দিনের ছুটিতে শুভ কলকাতার দিকেই আসেনি। অন্য কোথাও গেছে—

'কিন্তু পঞ্চানন মণ্ডল যেভাবে চিঠি লিখেছে তাতে তো মনে হয়—'—আমাকে কথা শেষ করতে দিল না তপনদা। বলল, 'আমার কিন্তু ওই চিঠি পড়েই সন্দেহটা বেড়েছে—

'একথা বলছ কেন?'—আমি প্রশ্ন করলাম।

'স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে একজন টীচারকে কি বিচ্ছিরি ভাষায় চিঠি লিখেছে লোকটা। রীতিমত শাসিয়ে—

'সেটা কি খুব অন্যায়। বছরের শুরুতেই কামাই করলে চটবে না! তাছাড়া গ্রামের লোক, অতশত গুছিয়ে লিখতে জানে না।'—আমি বোঝাতে চাইলাম।

তপনদা নস্যি নিয়ে বলল, 'ব্যাপারটাকে তুই যত সহজ ভাবছিস আসলে হয়ত তত সহজ নয়। আমার ধারণা—শুভ যে কলকাতায় আসেনি সেটা পঞ্চানন বুঝতে পেরেছে।'

'বারে, তাহলে কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখবে কেন?'

'সত্যি সত্যি শুভ কলকাতায় গেছে কি না হয়ত সেটা যাচাই করবার জন্য।'

'যাচাই করে লাভ?'

'লাভ কতটা তা এখখুনি বলতে পারব না। তবে পঞ্চাননের নির্ঘাৎ একটা কিছু মতলব আছে।'

'কিন্তু আর কোথায় যেতে পারে ছোটকা?'

তপনদা মৃদু হাসল, 'আমি তো আর শার্লক হোম্‌স নই। আগে ডুমুরখালি পৌঁছই। তারপর এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা যাবে।'

তপনদার বলা শেষ হলে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। এবার পুজোর ছুটিতে কলকাতায় এসে ছোটকা সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাত। বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত অব্দি জেগে মোটা মোটা বই পড়ত। প্রত্যেক বছর অষ্টমীর দিন রাতভর আমি ছোটকার সঙ্গে ঠাকুর দেখি। এবার বেরুবার কথা বলতে ছোটকা বলেছিল, 'বড়দিনের ছুটিতে এসে তোকে নিয়ে খুব ঘুরব নিরু। এবার আমি ভীষণ ব্যস্ত।'

'আজ অষ্টমী পুজো। আজ আবার কিসের এত ব্যস্ত ছোটকা?'—আমি রেগে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

'একটা দারুণ জায়গার সন্ধান পেয়েছি রে নিরু।'—উত্তর দেবার সময় ওর দুচোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল।

'জায়গাটা কোথায়?'

'ডুমুরখালি থেকে অনেক দূরে। সমুদ্রের কাছাকাছি—।'

'তার সঙ্গে আজ রাতে ঠাকুর দেখতে যেতে বাধাটা কোথায়? আজই তো আর তুমি ডুমুরখালিতে যাচ্ছো না।'—আমি সহজে হার মানতে চাইনি।

'ঠিক বলেছিস। আসলে কি জানিস—জায়গাটা যে সঠিক কোন-দিকে সেটা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। তাই তো আজ কদিন হল সমানে বই আর ম্যাপ ঘেঁটে যাচ্ছি।'

ভাবলাম কথাটা তপনদাকে বলি। কিন্তু সুযোগ পেলাম না। তপনদা ততক্ষণ যে লোকটা হাল ধরে বসেছিল তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। তপনদা বলছিল, 'তোমার নাম কি মাঝি?'

'আজ্ঞে, সমশের খাঁ।'

'থাকো কোথায়?'

'মাদারদহ। ডুমুরখালি থেকে একটু পশ্চিমে।'

'এ নৌকো তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কদ্দিন হল নৌকো বাইছো?'

'তা কি লেখাজোকা আছে। সেই কোন বাচ্চা বয়সে বৈঠা ধরেছিলাম।'—গোঁফে তা দিতে দিতে সমশের জবাব দিল।

'জঙ্গলের ভেতরে গেছো কখনো?'

'তা যাবো না কেন। ফি বছরই তো যাই লকড়ি আনতে।'

'জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে ভয় করে না?'

দুপাটি ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল সমশের, 'ভয় করলে কি চলে বাবু? আমরা গরীব মানুষ। পেটে টান পড়লে যেতেই হয়—

নৌকা ফের নদীতে পড়ল। জোয়ারের সময়। রোদে বিকেলের রং ধরেছে। শীতকাল হলেও তেমন হাওয়া নেই।

'আচ্ছা, ধরো সমশের, যদি বলি—আমাদের নিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে। যাবে? অবশ্য তার জন্য যা টাকা লাগবে দেব তোমাকে।' —তপনদার কথা ফুরুতেই চায় না।

সমশের বলল, 'কেন যাবো না বাবু। কেরায়া খাটাই তো আমার কাজ। তা কবে নাগাদ যেতে চান?'

তপনদার দুই ভুরুর মাঝখানে একটা সরু ভাঁজ পড়ল। ভেবে বলল, 'কাল বিকেলের দিকে ডুমুরখালির ঘাটে আসতে পারবে?'

'পারব।'—সমশের মাথা নাড়ল।

দিবানিদ্রা সেরে অবিনাশকাকা ছইয়ের বাইরে এলেন। আমি তখন তপনদার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। ওর মতি গতি বোঝে কার সাধ্য। তপনদা আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে হাসিতে রহস্য এঁকে থিয়েটারে যারা পার্টটার্ট করে তাদের মত মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'ধীরে বৎস; ধীরে। উতলা হয়ো না। সময় হলে সব খুলে বলব।'

নদীর বাঁকের মুখে ডুমুরখালি। দিনের আলো থাকতেই পৌঁছে গেলাম। ঘাটে রকমারি নৌকার ভিড়।

এখন বনের ভেতরে যাবার মরশুম। শীতে নদী শান্ত থাকে।

ঝড় তুফানের ভয় না থাকায় এসময়ে দলে দলে নৌকা জঙ্গলের দিকে যায়। বনের ভেতরে ঢুকে কাঠ কাটে। গোলপাতা, বুনো বেত সংগ্রহ করে। জেলেরা এসময় খালে-নদীতে 'কোমর-জাল' পাতে। একদল যায় মধু আনতে।

বেডিং বোঁচকা নিয়ে সমশেরও আমাদের সঙ্গে ডাঙায় উঠল। নদীর ঘাট থেকে ছোটকার স্কুল খুব একটা দূরে নয়। স্কুল-বাড়ি দেখে আমাদের চোখ তো ছানা বড়া। বাড়ি নয়, বড় একটা আটচালা। চারদিক খোলা। ছাউনি গোলপাতার।

অবিনাশকাকা বললেন, 'পাগল না হলে এখানে কেউ মাস্টারি করতে আসে।'

কথাটা ঠিক। ছেলেবেলা থেকেই ছোটকা একটু একগুঁয়ে আর খেয়ালি ধরণের। কোনো একটা ব্যাপারে একবার যদি গোঁ চাপল তাহলে আর রক্ষে নেই। ওকে থামায় কার সাধ্য। বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুনোর পর বাবা একটা ভাল মাইনের চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিল। মাস কয়েক কাজ করার পর বলা কওয়া নেই হঠাৎ একদিন ছোটকা বাকস প্যাটরা গুছিয়ে ডুমুরখালিতে চলে এসেছিল। আসার আগে আমাকে বলেছিল, 'বুঝলি নিরু, দশটা-পাঁচটা কলম-পেষা আমার ধাতে সইছে না। হোক প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারি। একটা নতুন জায়গা দেখা হবে তো।'

আমরা আটচালার কাছে এগিয়ে যেতে কোত্থেকে একজন বুড়ো মতন লোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। দুই হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'পেন্নাম, বাবুমশাইরা। কোত্থেকে আসছ তোমরা?'

'কলকাতা থেকে। তুমি কে?'—বললেন অবিনাশ কাকা।

'আজ্ঞে আমার নাম বিষ্টুচরণ। এই ইস্কুল বাড়ি ঝাটপাট দিই—

অবিনাশ কাকা আশ্বস্ত হলেন, 'তাহলে তো ভালই হল। আমি হলাম তোমাদের স্কুলের টীচার শুভব্রত মিত্র'র দাদা।'

'তাই নাকি। তা শুভ মাষ্টার বাবু এল না তোমাদের সঙ্গে ?'

'শুভ তো কলকাতায় যায় নি। পঞ্চানন বাবুর চিঠি পেয়ে আমরা ওর খোঁজে এসেছি।'—তপনদা বলল।

'সে কি কথা,' চমকে উঠল বিষ্টুচরণ, 'তাহলে মানুষটা কোথায় গেল ?'

'আমরাও তো তাই ভাবছি।'—আমি বললাম।

'কি জানি কোথায় গেছে। যা খ্যাপা মানুষ। মাঝে মাঝে দু তিন দিনের জন্য প্রায়ই কোথায় যে চলে যেত—'—মুখ কালো করে বলল বিষ্টুচরণ।

'তাই নাকি ?'—তপনদার চোখেমুখে বিদ্যুতের ঝলকানি ফুটে উঠল।

একটু দম নিয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গলার স্বর খাটো করে বলল বিষ্টুচরণ, 'আর এর জন্যই তো কত্তামশাইর সঙ্গে শুভমাস্টারবাবুর জোর কথা কাটাকাটি হত—

কর্তামশাটা আবার কে ?'—অবিনাশকাকা শুধোলেন।

'কর্তামশাইকে জানো না বাবুমশাই। আমাদের ডুমুরখালি লাটের বলতে গেলে সব জমিই যে ওনার।'

'তুমি পঞ্চানন মণ্ডলের কথা বলছ, না বিষ্টুচরণ ?'—তপনদা বলল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমি ওনার কথাই বলছি।'—বিষ্টুচরণ মাথা ঝাঁকাল।

তপনদা বলল, 'আচ্ছা বিষ্টুচরণ, শুভবাবু কোনদিকে যেতে পারে বলে মনে হল তোমার ?'

'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। কোনদিকে গেছে কি করে বলব ?'—বোঝা গেল তপনদার প্রশ্নে ওএকটু ঘাবড়ে গেছে।

'সে তো বটেই। তবু, বুঝতেই তো পারছ, কলকাতা থেকে আসছি। মানুষটা তো আর উবে যেতে পারে না। একটা খবর না নিয়ে বাড়ি ফিরি কোন মুখে —,'—তপনদা পাকা অভিনেতা। শেষের

দিকে তার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

চিড়ে তাতে ভিজল খানিকটা। গ্রামের সরল মানুষ। ফিস্‌ফিস্ করে বলল বিষ্টুচরণ, 'তোমারা একবার গোরা মাস্টারবাবুকে শুধোলে পারো। উনি হয়ত বলতে পারবেন—

'কাদের সঙ্গে কথা বলছিসরে বিষ্টু?'—হঠাৎ ওর পেছন থেকে কে যেন বাজখাই গলায় বলে উঠল।

বিষ্টুচরণ থর থর করে কেঁপে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে কত্তামশাই, এনারা কলকাতা থেকে এসেছে। শুভমাস্টার বাবুর লোক।'

কত্ত মশাই ওরফে পঞ্চানন মণ্ডল আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। চিঠি পড়ে লোকটাকে যেমন ভেবেছিলাম দেখতে কিন্তু তেমন নয়। নিরীহ, গোবেচারা ধরনের চোহারা। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। গোলগাল। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। গলায় সাড়ে তিন প্যাঁচ তুলসীর মালা। পরণে ফতুয়া, হাটুঅব্দি তোলা কাপড়। খালি পা।

পঞ্চানন মণ্ডল বলল, 'সে কি, শুভবাবু কলকাতায় যান নি?'

'না। আপনার চিঠি পেয়েই আসছি আমরা।'—অবিনাশ কাকা উত্তর দিলেন।

'একটা জলজ্যান্ত মানুষ, কলকাতায় যায় নি। তাহলে গেল কোথায়?'—পঞ্চানন মণ্ডলের কপালের ভাঁজগুলো কেঁপে উঠল।

'অচ্ছা, আপনার কি মনে হয় পঞ্চাননবাবু। কলকাতায় ফেরার সময় ডাকাতের হাতে পড়ে নি তো ছেলেটা?'—অবিনাশ কাকা বললেন।

অসম্ভব কিছুই নয়। বাদা অঞ্চল। এদিকে তো চোর ডাকাতেরই আড্ডা। তাছাড়া, শুভবাবুর হাতে ঘড়ি ছিল। একমাসের মাইনেও পেয়েছিলেন—; বলতে বলতে পঞ্চানন মণ্ডল কেমন আনমনা হয়ে গেল।

কিন্তু দিনেদুপুরে একটা মানুষকে খুন করা কি এতই সহজ!'—আমি বললাম।

পঞ্চানন মণ্ডল মুচকি হাসল, 'হ্যাঁ সহজ। সব কেড়েকুড়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিতে পারলেই হল। হাঙর-কুমীরের দল তো হাঁ করেই আছে।'

'তাহলে উপায়! থানায় গিয়ে একটা ডাইরি করব?'—অবিনাশ কাকা জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা মন্দ বলেন নি তবে ডাইরি করতে হলেও আজ রাতটা আপনাদের এখানেই কাটাতে হবে। যাবা যখন গোসাবায়—; পঞ্চানন মণ্ডল বলল।

স্কুল থেকে কিছু দূরে একটা দরমার বেড়াঅলা ঘর। পঞ্চানন মণ্ডল আমাদের সেখানে নিয়ে গেল। এই ঘরটাতেই ছোটকা থাকত।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে তপনদা ফিসফিস করে সমশেরকে কি সব যেন বলল। মাথা নেড়ে সমশের চলে গেল ঘাটের দিকে।

ছোট মাটির ঘর। একটা তক্তপোশ ঘরের এক পাশে। আরেক দিকে একটা কেরোসিনের ষ্টোভ। কিছু বাসন-কোসন। তক্তপোশের ওপর একটা সতরঞ্চি পাতা। বুঝলাম নিজের হাতে রান্না করে খেত ছোটকা।

পঞ্চানন মণ্ডল বলল, 'আমি এক্ষুণি একটা হ্যারিকেন পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাতের খাবার আমার লোক এসে দিয়ে যাবে। অনেক দুর থেকে এসেছেন। আপনারা একটু জিরিয়ে নিন। আমায় আবার একবার বন-বিবির থানে যেতে হবে। আজ পুজোর দিন—

পঞ্চানন মণ্ডল চলে যেতে তপনদা বেডিং খুলে তক্তপোশে বিছানা পাতল। ঘরের পিছনের দিকে একটা পুকুর। পুকুরের ওপাশে গাছতলায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

অবিনাশ কাকা বললেন, 'চলো, একবার বনবিবির পুজো দেখে আসি। অন্ধকার ঘরে বসে কি করব।'

তপনদা একটা হাই তুলে বলল, 'আপনি নিরুকে নিয়ে যান মামা

আমি বড় ক্লান্ত। একটু গড়াগড়ি যাই—

তপনদার কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। এইটুক্ দৌড়ঝাঁপে ওর কাহিল হবার কথা নয়। পুরো ছ'ফুট লম্বা, দিনে পাঁচশ বুক ডন আর মুগুর ভাঁজা শরীর। বুঝলাম—তপনদার অন্য একটা কিছু মতলব আছে।

পুকুরের ওপারে একটা হিজলগাছের কাছে বনবিবির থান। বনবিবি বনের দেবী। যারা জঙ্গলে ভেতরে কাঠ কাটতে, মধু আনতে কিংবা মাছ ধরতে যায় তারা আগে পূজো দিয়ে বনবিবিকে তুষ্ট করে নেয়। নইলে, এদের বিশ্বাস—জঙ্গলে গিয়ে বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ার ভয় থাকে।

বাঘের ওপরে বসে বনবিবি। ছোট মাটির মূর্তি। গায়ের রং হলুদ। মাথায় মুকুট, গলায় হার ও বনফুলের মালা। সারা গায়ে রকমারী অলংকার।

রাস্তায় মোড়ে বনবিবির থানের পাশে ছোটখাটো একটা মেলা বসেছে। মূর্তির সামনে খানিকটা জায়গা নিকোনো। বড় পেতলের গামলায় সিন্নী। আরো সব নৈবেদ্য রাখা হয়েছে। কদমা, বালি চিনি, পাটালি গুড়, ফলমূল, সাদা চিনির বাতাসা ইত্যাদি।

পঞ্চানন মণ্ডল থানের সামনে দাঁড়িয়ে। পুরোহিতকে কি সব যেন বলছে। ধুপ-ধুনো জ্বালানো হয়েছে। চারপাশে মাঝি মাল্লা গ্রামের মানুষের ভিড়। পুরোহিত এক সময় সুর করে বলতে শুরু করল,—

মা বনবিবি, তোমার বাল্লক এল বনে, থাকে যেন মনে।

শত্রু দুষমন চাপা দিয়ে রাখত গোড়ের কোণে।

দোহাই মা বরকদের, দোহাই মা বরকদের—

সঙ্গে সঙ্গে বালকের দল অর্থাৎ বনবিবির ভক্ত সন্তানেরা মাথা হেঁট করে বিড় বিড় করে কি সব যেন বলে উঠল।

আমি একফাঁকে সুট করে ভিড় থেকে কেটে মেলার দিকে চলে এলাম। ছোট গ্রাম্য মেলা। দোকানীরা রাস্তার ওপরে হোগলার

পাটি বিছিয়ে নানারকম পসার সাজিয়ে বসে আছে। কাচের চুড়ি, আলতা-সিঁদুর, বাচ্চাদের খেলনা, কাপড়, গামছা লুঙ্গি, দা-বঁটি-কোদাল-লাঙ্গলের ফলা—নানা রকমের লোহার তৈরি জিনিস, বেতের বোনা চুপড়ি ধামা কনকো, নানা রকমের মিঠাই, তরিতরকারী সবই আছে মেলায়।

কিছুটা এগুতে দেখলাম রাস্তার ধারে বেশ কিছু লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। আমি একজনকে শুধোলাম, 'ওখানে কি হবে?'

লোকটা বলল, 'বনবিবির পালা হবে বাবু।'

আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কাঁসি আর ঢোল নিয়ে দুটো লোক ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। একে একে নানা বেশে গায়কের দল এল। তারপর শুরু হয়ে গেল পালা গান।

কাহিনীটি সুন্দর। ধোনা মোনা দু ভাই। তারা মউলে। মানে মধু সংগ্রহ করে বেড়ায়। সুন্দরবনে যাবার সময় গ্রামেরই একটি বাচ্চা ছেলে ধোনা মোনাকে বলল, খুড়ো মশাইরা, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।—ধোনা-মোনা তো হেসেই খুন। তারা বলে, তুই যাবি কিরে দুখে। বনে যে বড় শেয়াল থাকে। দুখে বলল, থাকুক বড় শেয়াল, আজ কদিন হল না খেয়ে আছি। বনে গিয়ে মধু জোগাড় করতে পারলে খেয়ে তো বাঁচব। দুখের কথা শুনে ধোনা মোনার হৃদয় গলল। তাদের সঙ্গে দুখেও চলল বনের দিকে।

সুন্দরবনে বাঘের দেবতা হলেন দক্ষিণ রায়। জঙ্গলে ঢুকবার আগে ধোনা তাঁকে পুজো দিতে ভুলে গেল। দক্ষিণ রায় রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। স্বপ্নে দেখা দিয়ে ধোনাকে বললেন, আমি রক্ষ মুনির ছেলে। রক্ষমুনিকে সুন্দরবনের সকলে ভকতি করে। আমি বনরাজ্যের অধিপতি। আমাকে পুজো না দিয়ে তুই ভীষণ অন্যায় করেছিস। এর জন্যে তোকে খেসারৎ দিতে হবে। নইলে আমার বন

থেকে একটুও মোম কিংবা মধু পাবি না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধোনা বলল, কি খেসারৎ দেবতা ?—দক্ষিণ রায় গর্জন করে উঠলেন, আমাকে নরমাংস দিতে হবে। নইলে আমি শান্ত হব না।

ভয়ে তার বুক শুকিয়ে কাঠ। দেবতার আদেশ। অমান্য করলে আর রক্ষে নেই। কি আর করে ধোনা। ইচ্ছে নেই তবু প্রাণ ভয়ে গভীর জঙ্গলে বাচ্চা ছেলে দুখেকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে এল।

ভয়ংকর জঙ্গল। দিনের বেলাতেও জঙ্গলের ভেতরে সূর্যের আলো ঢোকে না। বনের ভেতর দারুণ বাঘ, বিষধর সাপ, বুনো মহিষের তাড়া খেয়ে দুখে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক বিষম দুরন্ত বাঘ তাকে হাঁ করে খেতে এল। পালাবার আর পথ নেই। 'মা, মা' বলে দুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বনবিবি জঙ্গলের গভীরে তার রাজধানীতে সিংহাসন আলো করে বসেছিলেন। 'মা' বলে দুখে কেঁদে উঠতেই তাঁর আসন কেঁপে উঠল। তিনি সব জানতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে নেমে ভাই সা জাঙ্গুলিকে নিয়ে বনের ভেতর ছুটে গেলেন। কোলে তুলে নিলেন দুখেকে। প্রকাণ্ড হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা বাঘটা আর কেউ নয়, স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বাঘের ছদ্মবেশে নরমাংস খেতে এসেছেন। বনবিবি তা বুঝতে পেরে সাজঙ্গুলীকে আদেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সা জঙ্গুলী এগিয়ে বাঘের মাথায় মুগুরের আঘাত করল। ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণ রায় ছুটতে ছুটতে বরখান গাজীর শরণাপন্ন হলেন। বরখান গাজীও সুন্দরবনের একটি অঞ্চলের অধিপতি। তিনি অনেক বুঝিয়ে বনবিবিকে শান্ত করলেন। বনবিবি কিন্তু সহজে ছাড়লেন না। দক্ষিণ রায়কে দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন,—

আঠার ভাটির মাঝে আমি সবার মা। মা বলি ডাকিলে কার বিপদ থাকে না। বিপদে পড়ি যে মা বলি ডাকিবে, কভু তারে হিংসা না করিবে।

ওদিকে ধোনা গ্রামে গিয়ে বলল—'দুখেকে বাঘে খেয়েছে।'

বনবিবি দুখেকে অনেক টাকা-পয়সা ধনরত্ন দিয়ে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। একটা কুমীর এসে দুখেকে পিঠে করে নিয়ে তার গ্রামে পৌঁছে দিল। দুখের মা ছিল কালা আর অন্ধ। বনবিবির কৃপায় সে ভাল হয়ে গেল। দুখে হল 'চৌধুরী', মানে জমিদার।

পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেরিকেন, মশাল শূন্যে তুলে এক—সঙ্গে বিকট চিৎকার করে উঠল—জয় বনবিবির মায়ের জয়—'

সামনে নদী। আকাশের এক কোণে সরু এক ফালি চাঁদ। ওপার অন্ধকার। ঘন জঙ্গলের দুর্গ। দূরে কোথাও একটা হিংস্র জন্তু আর্তনাদ করে উঠল। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। মনে মনে বললাম: কি হে, দি গ্রেট নিরুপম মিত্র। হরিশ মুখার্জি রোডের ডানপিটে ছেলে নিরু। এর মধ্যেই ভয় পেয়ে গেল।

অবিনাশকাকার ডাকে হুঁশ ফিরল। অবিনাশকাকা বললেন, 'আচ্ছা ছেলে তো তুমি নিরু। এই ভিড়ের মধ্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ। এদিকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—'

আমি হেসে বললাম, 'পালাগান শুনছিলাম অবিনাশকাকা।'

অবিনাশকাকা বললেন, 'অচেনা জায়গা। এরকম একলা ঘুরতে হয় কখনো।'

পুকুরপাড় ধরে ঘরের দিকে ফিরে আসবার সময় একবার মাঝ পথে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। একটু দূরে একটা বড় তেঁতুল গাছ। সেই গাছের ওধারে দুটি ছায়ামূর্তি। একজন চাপা গলায় বলছিল, 'ওরা তোকে কি জিজ্ঞেস করছিল?'

'কিছু না কত্তামশাই।'

কণ্ঠস্বর দুটিই আমাদের পরিচিত। পঞ্চানন মণ্ডল আর বিষ্টুচরণের।

'কিছু না!' ফের মিথ্যে বলছিস। তুই আমাকে চিনিস না। কেটে দুভাগ করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেব কিন্তু বলছি।' বুঝলাম—পঞ্চানন মণ্ডল খুব উত্তেজিত।

'আপনাদের ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বেস করুন—' কান্নাভরা গলায় বলে উঠেছিল বিষ্টুচরণ।

'ফের মিথ্যে কথা। আমি বুঝি দুর থেকে লক্ষ্য করিনি। তুই গুজ গুজ করে কি সব যেন বলছিলি ওদের। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি তোর।'—পঞ্চানন মণ্ডল গর্জে উঠল।

অবিনাশকাকা আমার হাত ধরে টেনে চাপাগলায় বলেছিল, 'চলো নিরু, এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। ওরা দেখে ফেলবে।'

ঘরের কাছাকাছি আসতে দেখি—ভেতরে আলো জ্বলছে। তপনদা কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। ভেতরে ঢুকতে তপনদা আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিল। নাম জন পেরেরা। লাল টকটকে গায়ের রঙ। লম্বাটে ধবনের মুখ। মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। স্বাস্থ্য বেশ মজবুত। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গলায় নিকেলের সরু হারে একটা ক্রশ ঝুলছে। ছোটকার সহকর্মী। তবে জন ডুমুরখালি প্রাইমারী স্কুলে আছে অনেককাল। ছোট ইস্কুল। ছাত্র সংখ্যা খুব কম। শিক্ষক মাত্র তিনজন। ওর কথায় জানতে পারলাম—আরেকজন শিক্ষক আজই তার গ্রামে বাঙ্গাবেলিয়ায় গেছে। আজ শনিবার। ফিরবে পরশু। বুঝলাম—জনই বিষ্টুচরণের গোরামাস্টারবাবু।

জন বলছিল, 'পঞ্চানন মণ্ডলের কোন কথা বিশ্বাস করবেন না তপনবাবু। ও একটা জ্যান্ত শয়তান।

'তাহলে আপনার ধারণা—শুভ কলকাতার দিকে যায়নি। সুন্দর-বনের দিকেই গেছে কোথাও?' —তপনদা প্রশ্ন করল।

জন সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আলবৎ জঙ্গলের দিকে গেছে।'

'আপনার এই অনুমানের কারণ?'—জেরার ভঙ্গীতে বলল তপনদা।

'কারণ, মানে—মাঝে মাঝেই তো শুভবাবু ডিঙি ভাড়া করে জঙ্গলের দিকে যেতেন। এবার ছুটিতে যখন কলকাতায় যাননি, তখন জঙ্গলের দিকে ছাড়া আর কোথায় যাবেন।' আমতা আমতা করে বলল জন।

'ডাকাতের হাতে পড়ে নি তো?' অবিনাশকাকা পুরনো কথাটা আবার তুললেন।

'ডাকাতের হাতে! নিশ্চয়ই পঞ্চানন মণ্ডল আপনাদের এসব কথা বলে ভয় দেখিয়েছে। এটা কি মগের মুলুক নাকি! রাতদিন নদীতে জলপুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। 'তাছাড়া গোসাবার দিকে গেলে ডাকাত কোথায়?'—জন বলল।

তপনদা হাসল, 'এখন না হোক আগে তো সুন্দরবন মগ আর ফিরিঙ্গিদেরই মুলুক ছিল। এই ধরুন না, আপনি তো জাতিতে পর্তুগীজ। পনের কুড়ি পুরুষ বাদে না হয় বাঙ্গালীই হয়ে গেছেন—'

জন চোখ বড় করে বলল, 'আমি পর্তুগীজ এটা আপনি বুঝলেন কি ভাবে?'

'খুব সহজেই। প্রথমত আপনার উপাধি পেরেরা। ওটা সাধারণতঃ পর্তুগীজদেরই হয়। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে পড়েছি হার্মাদরা মানে পর্তুগীজ জলদস্যুরা এক সময় সুন্দরবন এলাকায় আস্তানা গেঁড়েছিল।'—তপনদা হাসতে হাসতে বলল।

'ঠিক ধরেছেন,' জন বলল, 'তবে এখন আর আমরা পর্তুগীজ নই, পুরোপুরি ভারতীয় বনে গেছি।'

'আপনার কথাই মেনে নিলাম জন। কিন্তু এতদিন শুভ জঙ্গলের ভেতর কোথায় ঘুরবে। আর যাবেই বা কেন?'—তপনদা একটিপ নস্যি নিয়ে প্রশ্নটা করল।

জনের মুখ মুহূর্তে থমথমে হয়ে উঠল, 'কোথায় গেছেন আমি জানি না। তবে এতদিন জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ানো, আমি তো ভাবতেই পারি না।

জনের কথা শেষ হতে টিফিন কেরিয়ার হাতে একজন লোক ঘরে ঢুকল।

খাওয়ার পাট চুকে যেতে অবিনাশ কাকা তক্তপোশে উঠে চুরুট ধরালেন। আমাদের বিছানা পাতা হল মাটিতে।

তপনদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মামাবাবু, 'ঘোষড়' কথাটার মানে কি?'

অবিনাশকাকা একটু ভেবে বললেন, 'ঘোষড়! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঘোষড় মানে গভীর জঙ্গল! যে জঙ্গলে সহজে ঢোকা যায় না।'

'নলছ্যাও' কাকে বলে?—ফের জিজ্ঞেস করল তপনদা।

'নলছ্যাও মানে কোণাকুণি নৌকা বেয়ে বড় নদী পার হওয়া।

'আর বড়মেঞা কি?'—তপনদার প্রশ্নের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুন্দরবন-বিশারদ অবিনাশ কাকা হেসে উঠলেন, 'বড় মেঞা কাকে বলে জানো না। দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

'চামটা আর নারায়ণটোলা কোথায়?'—তপনদার প্রশ্ন শেষ হতে চাইছিল না।

'চামটা!' দু চোখ গোল-গোল করে বললেন অবিনাশ কাকা, 'ওরে বাবা, সে এক ভয়ংকর দ্বীপ। সুন্দরবনের সবচেয়ে বেশি বাঘ ওখানে আছে। নারায়ণটোলা আরো দক্ষিণে।'

'আর একটা প্রশ্ন করব মামাবাবু। বঙ্গ দুনী বলে কোন জায়গার নাম শুনেছেন?'

নিভে যাওয়া চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন অবিনাশকাকা, 'শুনেছি বটে। কিন্তু সেতো অনেক দূরে। একেবারে বঙ্গোপসাগরের মুখে। কিন্তু এতসব জানতে চাইছ কেন তপন?'

তপনদা বলল, 'না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম—'

অবিনাশ কাকা তক্তপোশে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণবাদেই তার নাসিকা গর্জন শুরু হয়ে গেল।

তপনদা উঠে দরজার খিল এঁটে দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'একটা দারুণ জিনিস পেয়েছি নিরু দেখবি?'

'কি জিনিস?' আমি জোরে বলে উঠলাম।

তপনদা ধমকের সুরে বলল, আঃ 'আস্তে বল।' তারপর হামাগুড়ি দিয়ে তক্তপোশের তলায় ঢুকে গেল। টেনে বের করে আনল একটা, টিনের বাক্স। দেখেই চিনতে পারলাম। বাক্সটা ছোটকার। তপনদা ডালা খুলল। প্রথমে বেরুল কয়েকটা জামাপ্যান্ট। তারপরে একটা মশারি। সবশেষে একেবারে তলা থেকে একটা মলাটছেড়া খাতা টেনে বের করল তপনদা। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা উল্টেপাল্টে ছ্যাখ একবার—

হেরিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে আমি খাতাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। একের পর এক পাতা উল্টে চললাম। কোথাও বনজঙ্গলের ছবি। কোনো পাতায় আবার ম্যাপ আঁকা। একটা পাতায় এসে থমকে গেলাম। দেখি লেখা আছে—সেপ্টেম্বর মাসের খরচ —

চিটে গুড় —	তিন টাকা
সপ্তদ্বীপ ভ্রমণ বাবদ	দুই টাকা
ধনে ও কালজিরে —	এক টাকা
ছাঁচি পান —	চার আনা
	মোট—ছ'টাকা চার আনা

হাতের লেখাটা ছোটকার।

হিসেবটা আমার কাছে গোলমেলে ঠেকল। হঠাৎ চিটে গুড় কিনতে যাবে কেন ছোটকা! সপ্তদ্বীপ কোথায় আমি জানি না। কিন্তু সেখানে যেতে খরচ মোটে দু'টাকা! ছোটকা নিজের হাতে রান্না করে খেত। তাই এক টাকার ধনে কালজিরে কেনাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ছাঁচি পান কেন? ছোটকার কোন নেশাটেশা নেই। পান তো দূরের কথা, ওকে কোনদিন আমি এক কুচি সুপুরীও দাঁতে কাটতে দেখিনি।

তপনদা মিটিমিটি হাসছিল। সে বলল, 'কিরে, কিছু বুঝলি?'

'না তবে—

'হ্যাঁ। ওই 'তবে'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য। আর সেই রহস্যের কিনারা খুঁজতে গিয়েই শুভ নিখোঁজ হয়েছে—

রহস্যটা কি—'ধরতে পারছি না তো।

তপনদা বলল, 'ঠিক আছে। ভাল করে দ্যাখ্। খরচ বাবদ যে অংকের টাকা এবং আনা লেখা আছে সেই অংকগুলো পড়ে যা দেখি।'

আমি পড়ে গেলাম, 'তিন দুই এক চার—

তপনদা ফের একটিপ নস্যি নিল, 'বেশ। এবার এই সংখ্যা অনুযায়ী বাঁ দিকে লেখা শব্দগুলি থেকে চারটে অক্ষর তুলে পরপর মনে মনে সাজিয়ে ফ্যাল—

'গু-প্ত-ধ-ন।' মনে মনে নয়। অক্ষরটা উচ্চারণ করতে গিয়ে শেষের দিকে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফের বললাম, 'গুপ্তধন কথাটা না-হয় উদ্ধার করা গেল। কিন্তু ছোটকা ওপরে সেপ্টেম্বর মাসের খরচ কথাটা লিখল কেন?'

তপনদা আমার মাথায় আলতো করে একটা চাঁটি মেরে বলল, 'এইটুকু ধরতে পারলি না বুদ্ধুরাম। শুভ বলতে চাইছে—সেপ্টেম্বর মাসে ও গুপ্তধনের কথা জানতে পেরেছিল—

এবার বুঝতে পারলাম। মনে পড়ে গেল পূজোর ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে প্রথম ছোটকা আমাকে একটা জায়গা আবিষ্কারের কথা বলেছিল।

আমি ফের প্রশ্ন করলাম, 'ধরে নিলাম—ছোটকা গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়েছে। কিন্তু সুন্দরবন তা একটা ছোটখাট জায়গা নয়। জঙ্গলের ভেতর কোথায় খুঁজবে ওকে?

তপনদা গম্ভীর চালে বলল, 'এবার শেষের পাতা খোলা ধরতে পারবি শুভ কোনদিকে গেছে।'

আমি তাড়াহুড়ো করে শেষের পাতাটা খুললাম। দেখি লেখা আছে—

ডুমুরখালিতে বাস করে
কলি বাউলের পো,
জয়নন্দি নামে খ্যাত
বড় তার গো।
তিন ভাঁটি নৌকা বাইয়া
দত্তর গাং ধরে,
নলছ্যাও দিয়া বাউলে
গোসাবায় পড়ে।
চামটা নারায়ণটোলা
মায়াদ্বীপ আলা,
হাঁকডাকে বড়মেঞার
কলিজা উতলা।
সুমুন্দরে ঝড় তুফান
দূরে ভাঙ্গা তুনী
তারই কাছে ঘোষড় মধ্যে
ফিরিঙ্গির রাজধানী।

আমি আর বোকা বনতে রাজী নই। বারতিনেক কবিতাটা পড়ে ফেললাম। অর্থটা খোলসা করে বলতে তপনদা খুব খুশি। বলল—'এই তো ঠিক ধরতে পেরেছিস।'

এবার আমার প্রশ্নের পালা। বললাম—'সঠিক জায়গাটা কোথায় তা তো লেখা নেই এখানে।'

'আগে বঙ্গতুনীতে পৌঁছাই তো। তারপর ঠিক খুঁজে বার করব।'

'ফিরিঙ্গির রাজধানী মানে?'

'রাজধানী কথাটা হয়ত বাড়িয়ে বলা হয়েছে। আসলে ওটা হবে ফিরিঙ্গিদের একটা আস্তানা।'

'ফিরিঙ্গি কারা?'

'ফিরিঙ্গি বলতে এখানে পর্তুগীজ জলদস্যুদেরই বোঝানো হচ্ছে।'

'সমুদ্রের ধারে জলদস্যুদের আস্তানা। কিছুই যে বুঝতে পারছি না তপনদা।'

ইতিহাসের তুখোড় ছাত্র, গবেষক তপনদা বলল—'হ্যাঁ একটা দুটো নয়—একসময় পাঁচ-পাচটা বিরাট বন্দর তৈরী করেছিল পর্তুগীজরা। এই সুন্দরবন অঞ্চলে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। সেগুলির নাম প্যাকাকুলি ~র্গপচাভ জ নলদী ডাপরা আর টিপাশা।'

আমি বললাম, '~ হলে কি আমরা ওরই কোন একটা জায়গায় যাচ্ছি?'

'এদিককার ইতিহাস তো কম ঘাঁটিনি। যতদূর মনে পড়ছে—ওদিকে কোন বন্দর-টন্দর ছিল না।' —মাথা নেড়ে বলল তপনদা।

'তাহলে?'

তপনদার মুখে ধীরে ধীরে একটা আলো ফুটে উঠল, তাহলে আর কি। আমরা বোধহয় এমন এক পুরনো জায়গা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি যার কথা কেউ জানে না। যদি একবার আস্তানাটার খোঁজ পেয়ে যাই তবে কলকাতায় ফিরে এমন হই-হই রই-রই কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলব যে—

বুঝলাম—তপনদা নতুন এক আবিষ্কারের স্বপ্নে মশগুল। আমার আবার ইতিহাস টিতিহাস মাথায় ঢোকে না। তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম 'কিন্তু সেখানে যাবে কি করে? পথ যে ভীষণ—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই চোখের পলকে তপনদা কিটব্যাগ থেকে তিন ব্যাটারীর ঢাউস টর্চটা বের করে উঠে দাঁড়াল। তারপর দরজা খুলে এক লাফ দিল বাইরে।

কিছু বুঝতে না পেরে আমি ওর পিছু নিলাম। তপনদা ততক্ষণে মাঠের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। অনেক দূরে একটা ছায়ামূর্তি।

কিছুক্ষণবাদে তপনদা ফিরে এসে বলল, না, ব্যাটাকে ধরতে পারলাম না।'

লোকটা কে, পঞ্চানন মণ্ডল-নাকি'—প্রশ্ন করলাম।

'পঞ্চানন হলে তো ব্যাটাকে ধরেই ফেলতাম।' যা মোটা

'লোকটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল?'

ঘরের পেছনের দিকটায়। তুই যখন প্রশ্ন করছিলি হঠাৎ মনে হল কেউ যেন বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা সব শুনছে।'

'বলো কি!'—ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

হ্যাঁ। বুঝলি নিরু, আমার কিন্তু, ক্রমশঃ এক দারুণ চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছি—

কেন, আমরা তো কারুর ক্ষতি করতে চাইছিনা। এসেছি ছোটকার খোঁজে—

'কিন্তু ওই যে গুপ্তধন। মৌচাকে ঢিল পড়েছে যে।'

তপনদা তার চামড়ার সুটকেশের ভেতর থেকে একটা নেপালী ভোজালী বের করল। তারপর হেরিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বলল নে শুয়ে পড়। অনেক রাত হল—

আমি পায়ের কাছ থেকে একটা কম্বল টেনে নিয়ে বললাম, তুমি শোবে না!'

নারে। আজ বোধহয় আমাকে রাতটা জেগেই কাটাতে হবে। লোকটা আবার আসতে পারে।

আমি কম্বলের তলায় ঢুকে যাবার আগে ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম, আবার আসবে কেন। যা জানার তা তো জেনেই গেছে।

তবু সাবধানের মার নেই।— তপনদার গলটা ভারি ঠেকল।

তপনদা বসেই রইল। অনেক রাত অব্দি আমি জেগেছিলাম। প্রথমে ভয়। তারপর নিশুতি পাড়াগাঁ—শেয়ালের একটানা চিৎকার। সেই সঙ্গে ফাঁকা জায়গা, দরজার বেড়ার ফাঁক দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকছিল। আর মাটি থেকে হিম উঠছিল।

খুব ভোরে অবিনাশকাকা আমাকে ডেকে তুললেন। চারদিক ফরসা হয়ে গেছে। অবিনাশকাকা বললেন, তপন যে এই ভোরে কোথায় গেল—

'সেকি!'

'হ্যাঁ, ঘুম ভাঙতে দেখি দরজা খোলা। তপন নেই—'

আমার কান্না পেয়ে গেল। অচেনা জায়গা। তপনদা যদি কোন বিপদে পড়ে থাকে!

অবিনাশকাকা বললেন, চলো, একবার গ্রামের দিকে যাই। মনে হচ্ছে—তপন পঞ্চানন মণ্ডলের বাড়ি গেছে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেলা তখন মোটে সাড়ে ছ'টা। চারদিক খোলামেলা। দূরে নদী। আজ কুয়াশা পড়েনি। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। মাথা অব্দি চাদরে ঢেকে আমরা গ্রামের দিকে চললাম।

রাস্তার মুখে তপনদার সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছিল। অবিনাশকাকা বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

তপনদা বলল, 'সেসব কথা পরে হবে। আগে ঘরে চলুন শিগ্‌গীর। এখ্‌খুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের।'

আমাদের কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই ঘরের দিকে ছুটতে লাগল তপনদা;

অবিনাশকাকা একটু বিরক্তই হলেন। বললেন, 'তপন যে কি পাগলামি শুরু করেছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ঝটপট বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে আমরা ঘাটে চলে এলাম। তখন সার বেঁধে কাঠুরিয়া আর মৌলেদের নৌকা ঘাট ছেড়ে বনের দিকে যাচ্ছিল। আমাদের দেখেই একটা নৌকা থেকে সমশের পাড়ে উঠে এল। তার পিছু পিছু এল এক ছোকরা। আমার বয়সী হবে।

সমশেরকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ওর তো বিকেলের দিকে আসার কথা। সে কথা বলতেই তপনদা বলল, 'হ্যাঁ, গোসাবা থেকে আসবার সময় ওকে বিকেলের দিকে আসতে বলে ছিলাম ঘাটে। কিন্তু এখানে এসেই আমার কেন জানি মনে হয়েছিল একটা রাতের বেশি ডুমুরখালিতে থাকা উচিত হবে না। তাই কাল যখন ও আমাদের ইস্কুল বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়েছিল—তখনই আড়ালে ডেকে

সমশেরকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম

বলেছিলাম সকালে আসতে। এখন দেখছি ভালই করেছিলাম। ও না এলে বিপদে পড়তে হত।'

'বিপদ, কিসের ?' মুখ ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে গেল।

'আগে তো নৌকায় ওঠ। পরে বলব সব।' —ধমকে উঠল তপনদা।

নৌকা ছেড়ে দিতে তপনদা বলল, 'সমশের, হেলে-বটতলা চেনো ?'

সমশের বলল, 'কেন চিনব না বাবু। ওইযে দূরে খালটা ঢুকে গেছে —ওখানে।'

আগে একবার হেলে-বটতলায় নৌকা ভিড়াতে হবে যে—

'ঠিক আছে বাবু।' মাথা ঝাঁকাল সমশের।

দারুণ ইচ্ছে করলেও তপনদাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না।

অবিনাশকাকা ছইয়ের ভেতর। আপন মনে ফোঁস ফোঁস করছিলেন। ওর আবার ঘুম থেকে উঠার পর এক-কাপ চা না জুটলে মেজাজ বিগড়ে যায়।

আমি গলুইয়ে বসে যে ছেলেটি বৈঠা চালাচ্ছিল তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। শুধোলাম, তোমার নাম কি ?

আবদুল।

সমশের কি হয় তোমার ?

'বাপ।'

'জঙ্গলের দিকে গেছ কখনো ?'

হ্যাঁ। কালই তো গিয়েছিলাম। মাছ ধরতে।

তাই নাকি ! তা কি মাছ ধরলে ?

বড় একটা কৈভোল।

আচ্ছা আবদুল, জঙ্গলের দিকে যে যাও, কখনো বড়মেঞাকে দেখেছ ?

আমি নিজের বিদ্যা জাহির করতে চাইলাম।

আবতুল হেসে বলল, না। বড় মেঞার সঙ্গে দেখা হলে কি আর ফিরে আসা যায়।

আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল।

হেলে-বটতলার কাছে আসতে ঘাট থেকে একটা ডিঙি আমাদের নৌকার কাছে চলে এল। ডিঙি থেকে একজন নৌকায় উঠতে তপনদা বলল, কি গো তমিজভাই, পঞ্চানন মণ্ডল টের পায় নি তো?

আজ্ঞে না বাবু। লোকজন যোগাড় করে মণ্ডলের বেলা করে আমাদের বাড়িতে আসার কথা ছিল।—লোকটা বলল।

ওদের কথাবার্তা থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। কালি বাউলের তুই ছেলে। জয়নদ্দি আর তমিজদ্দি। ওরা তুজনেই গত বছর ফিরিঙ্গির রাজধানীতে গিয়েছিল। জয়নদ্দি ফিরে আসতে পারেনি। বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। অনেক কষ্টে তমিজদ্দি ফিরে আসে। তমিজদ্দির কাছ থেকেই ছোটকা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিল। ছোটকা অনেকবার তমিজদ্দিকে ফিরিঙ্গিদের রাজধানীতে নিয়ে যেতে বলেছিল। রাজী হয়নি সে। কলি বাউলের বারণ ছিল। এক ছেলে মরেছে, আরেকটাও যদি বাঘের হাতে পড়ে এই তার ভয়। পঞ্চানন মণ্ডল ব্যাপারটা আগেই আঁচ পেয়েছিল। আমরা ডুমুরখালিতে পৌঁছুতে ওর সন্দেহটা আরো বেড়ে গিয়েছিল। তাই কাল রাতেই পঞ্চানন কলিবাউলের বাড়িতে গিয়ে শাসিয়েছিল তাকে। পঞ্চাননকে ভয় পায় না এমন এ অঞ্চলে নেই। প্রাণের দায়ে কলি বাউলে রাজী হয়ে গিয়েছিল। তমিজদ্দিকে নিয়ে আজই রওনা হবার কথা পঞ্চাননের। কিন্তু পঞ্চাননের আগেই তপনদা কলি বাউলের বাড়িতে যায়। তমিজদ্দিকে ডেকে ফিরিঙ্গির রাজধানীতে নিয়ে যাবার কথা বলতে সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে যায়। পঞ্চানন মণ্ডলকে তু'চক্ষে দেখতে পারে না তমিজদ্দি।

ওদের সব কথা শোনার পর আমি আবতুলের কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাস করলাম, 'আচ্ছা আবতুল, বাউলে মানে কি?'

আবদুল বিজ্ঞের মত হেসে বলল, 'বাউলে কাকে বলে জানো না। বাউলে হল বাঘের ওঝা। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকবার সময় ওদের সঙ্গে নিতে হয়। ওরা পথঘাট সব চেনে। মন্ত্র পড়ে বাঘেদের তাড়িয়ে দেয়।'

বেলা নটা নাগাদ আমরা মাদারদহে পৌঁছুলাম। ডুমুরখালির চেয়ে বড় গ্রাম। দোকানপাট সবই আছে। খাওয়াদাওয়ার শেষে অবিনাশকাকাকে ডেকে তপনদা বলল, 'দেখুন মামাবাবু আমরা আজ সুন্দরবনের দিকে রওনা হব। যদ্দুর মনে হচ্ছে শুভ জঙ্গলের দিকে গেছে। নৌকা ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি ইচ্ছে করলে গোসাবায় যেতে পারেন। সেখান থেকে লঞ্চে চেপে—

'তার মানে', অবিনাশকাকার মুখের চেহারা মুহূর্তে পাল্টে গেল, 'তুমি আমাকে কি ভাবো বলো তো। তোমরা শুভকে খুজতে জঙ্গলের দিকে যাবে—আর আমি স্বার্থপরের মত কলকাতায় ফিরে যাব, অ্যাঁ।'

অবিনাশকাকার এ মূর্তি আমি আগে কখনো দেখিনি। তপনদা মাথা চুলকে বলল, 'না, মানে—নদী-জঙ্গলের দেশ। পথে নানারকমের ভয়। আপনি কি এসব সহ্য করতে পারবেন। তাই বলছিলাম—

সে-কথায় আরো তেতে উঠলেন অবিনাশকাকা, 'হ্যাঁ, বয়সটা আমার অবশ্য পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তাই বলে কষ্ট সহ্য করতে পারব না—এ কথা ঠিক নয়।'

তপনদা খুশি হয়ে বলল, 'বন্দুক চালাবার অভ্যেস আছে মামাবাবু?'

তা একটুআধটু আছে বৈকি। বাঘটাঘ শিকার না করলেও যখন এদিকে ছিলাম—দু'চারটে হরিণটরিণ আর বুনো শুয়োর তো মেরেছি—

এরপর বড় একটা পানসী নৌকায় চড়ে বসলাম আমরা। সমশের আর আবদুল ছাড়া আরো দুজন দাঁড়ি মাঝিকে সঙ্গে নেওয়া হল।

সমশের তপনদার কথামত কোত্থেকে দুটো দেশী বন্দুক জোগাড় করে নিয়ে এল। কয়েক মণ চাল ডাল, চা-চিনি ছাড়াও বড় বড় মাটির কলসী ভরে খাবার জলও সঙ্গে নেওয়া হল। পানসীর সঙ্গে একটা ছোট ডিঙি বাঁধা হল। 'বদর বদর' বলে পাঁচপীরের নাম করে নৌকা যখন ছাড়ল তখন বেলা দুটো।

শীতের দুপুর। নদীর নোনা জলে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। জোয়ারের সময়। সমুদ্র খুব বেশি দূর নয় বলে এদিকে দিনে রাতে দুবার করে জোয়ার-ভাটা হয়। নৌকা চলেছে নদীর মাঝখান দিয়ে। একদিকে শস্যক্ষেত আর মানুষের বসতি। অন্য দিকে ঘন সবুজ অরণ্য।

আমি আবদুলের গা ছুঁয়ে বসে আছি। ওর কাছ থেকে সুন্দরবন সম্পর্কে নানা কথা জেনে নিচ্ছি। মাঝে মাঝে দু-একখানা করে নৌকা চোখে পড়ছে। বেশির ভাগই জেলে নৌকা। একটা বড় ঘাসি নৌকাও দেখলাম। তাতে ডাঁই করে কাঠ আর গোলপাতা সাজানো রয়েছে।

হঠাৎ সমশেরের চিৎকারে পাশ ফিরে তাকালাম। তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। নদীর জলে হাজার হাজার পাখি। নীলের সঙ্গে ছাই রং মেশালে যেমন হয়—তেমনি গায়ের রং। দেখতে অবিকল হাঁসের মত। ঢেউয়ের দোলায় ভাসছে। আমরা কাছাকাছি পৌঁছুতেও ওরা উড়ে পালাল না।

পরে তপনদার কাছে শুনেছিলাম—এইসব পাখি দেশ থেকে আসে। কখনো সুদূর সাইবেরিয়া থেকে, কখনো বা অস্ট্রেলিয়া থেকে, এরা হাজার হাজার মাইল পথ উড়ে এসে সুন্দরবনের নদীগুলিতে ভিড় জমায়। শীত ফুরুলে আবার দেশের পথে পাড়ি দেয়।

নৌকো থেকে হাত বাড়িয়ে পাখিগুলোকে ধরা যায়। সে কথা চুপি চুপি আবদুলকে বলতে সে বলল, 'এ পাখি দিয়ে তুমি কি করবে বাবু! আমার কাছে পাখি ধরার জাল আছে। তোমাকে

একটা ভীমরাজ পাখি ধরে দেব।'

ভীমরাজ! সে আবার কি পাখি?—আমার প্রশ্ন।

'খুব সুন্দর দেখতে। আর মানুষের মত কথা কয়'।

'বলো কি আবদুল'।

'হ্যাঁ দাদাবাবু' আবদুল বলল, 'অনেক সময় মৌলে আর কাটুরিয়ারা ভীমরাজের ডাক শুনে ভাবে জঙ্গলে বুঝি মানুষ ঢুকেছে'।

সূর্যের তেজ কমে বিকেল হয়ে এলে সেই দিনই আবদুলের পাখি ধরার সুযোগ ঘটে গেল। আমাদের নৌকা তখন বড় নদীতে এসে পড়েছে। দারুণ স্রোত। স্রোতের উল্টো দিকে নৌকা বাওয়া কঠিন। তাই সমশের জঙ্গলের কাছাকাছি নৌকা নোঙর করল। সন্ধ্যার একটু পরেই ভাটা পড়বে। ঠিক হল, তখন আবার নৌকা ছাড়া হবে।

সামনেই ঘন বনের মধ্যে এঁকে বেঁকে একটা খুব সরু খাল ঢুকে গেছে।

জঙ্গলের গা ঘেঁসে নদীর পাড় ধরে বকের ভিড়। কাদায় পা ডুবিয়ে জল থেকে কুচোমাছ ঠোঁটে তুলে নিচ্ছে। গাছের মাথায় অজস্র পাখী। মাছাল, চিল, কুকড়ে বাটাং, চাতক, মদনা, মাণিক, গয়াল—বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে।

আবদুল পাটাতনের একটা কাঠ খুলে তার ভেতর থেকে জাল বের করতে করতে বলল, চলো দাদাবাবু, ডাঙায় নামব। এখানে নিশ্চয়ই ভীমরাজ আছে।

সে কথা শুনে অবিনাশকাকা হা-হা করে উঠলেন, ঘোর জঙ্গল। তোমরা ডাঙায় নামবে মানে?

আবদুল তখন জালে এক রকমের বুনো আঠা মাখাচ্ছিল। সে বলল, 'হ্যাঁ, পাখী ধরতে যাব।'

ছোট একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে বলল আবদুল,
'কেন এই যে কুড়ুলটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বলো কি',—চোখ কপালে তুললেন অবিনাশ কাকা, 'সঙ্গে কোন অস্ত্র না নিয়ে তোমরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকবে। তা হয় না। চলো, আমিও যাচ্ছি।' বন্দুক একটা তুলে নিলেন অবিনাশকাকা।

ছোট একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে বলল আবদুল, 'কেন এই যে —কুড়ুলটা সঙ্গে নিচ্ছি।' —গাঁয়ের মানুষ যখন বনে ঢোকে তখন আত্মরক্ষার জন্যে এক ধরনের ছোট কুড়ুল সঙ্গে নেয়।

অবিনাশকাকা বললেন, 'এটা দিয়ে কি করবে। যদি বাঘে তাড়া করে?'

'করবে না'—বলে পানসী থেকে পাশের ডিঙিটাতে নেমে গেল আবদুল।

'করবে না', রীতিমত ক্ষেপে গেলেন অবিনাশকাকা। মুখ ভেংচে বললেন, কি করে জানলে?'

শেষ পর্যন্ত আমাদের বাঁচাল তমিজুদ্দি। সে বাউলে। দূর থেকে দেখেই সে বনের নাড়িনক্ষত্র বলে দিতে পারে। বলল, ভয় নেই কর্তা। দিনের আলো আছে। ওরা তো জঙ্গলের একেবারে ভেতরে ঢুকছে না। পাখী ধরতে কতক্ষণ। যাবে আর আসবে।

তপনদা কিংবা সমরেশর কেউই আবদুলকে বাধা দিল না। আমি তপনদার দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে নিলাম। তারপর ডিঙিতে চেপে বসলাম।

দড়ি খুলে দিয়ে বৈঠা বাইতে শুরু করল আবদুল। হাত পঁচিশেক দূরেই ডাঙা। আমরা সেদিকে গেলাম না। 'শীষ' নামে একটা সরু খালের দিকে এগুতে লাগলাম।

শীষের দুধারে জঙ্গল। পাচিলের মত উঁচু পাড়। দুপাশে গাছ থেকে বড় বড় লতা নেমে এসেছে। আমরা মাথা নিচু করে এগুচ্ছিলুম। একটু ভেতরে গিয়ে পাখির কিচির-মিচির ডাকে মুখ তুলে তাকালাম। ঘন জঙ্গল। সূর্যের আলো মাটি অব্দি পৌঁছোয়নি। গা ছম্ ছম্ করছিল। কিন্তু পাখিগুলোর দিকে তাকাতেই মন থেকে সব ভয় দূরে

চলে গেল। একটা গরাণ গাছের ডালে যেন পাখির একজিবীশন বসেছে। ফিঙ্গে, দোয়েল, ঘুঘু, তুধরাজ, রক্তরাজ আর ভীমরাজের মেলা। গরাণ গাছটা ছড়িয়ে আমরা আরো একটু ভেতরে ঢুকে গেলাম। তারপর জল থেকে বৈঠা তুলে কাদায় গেঁথে বৈঠার সঙ্গে ডিঙিটাকে বেঁধে দিল আবতুল। এদিকে বনের তলার দিকটা বেশ অন্ধকার। বুনো লতার ভিড়ে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিলাম না।

একটা কেওড়া গাছের মোটা শিকড় জলের দিকে নেমে এসেছে। আবতুল ঝুঁকে শিকড়টা ধরল। আমি বললাম, এখানে নামছ কেন আবতুল ?

আবতুল আমাকে ইশারায় চুপ করতে বলল। তখন মনে পড়ে গেল তপনদা আগেই বলেছিল—জঙ্গলে ঢুকে কথা বলা চলবে না। সব কথা ইশারায় সারতে হবে। একবার মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলে বনের পশুরা সজাগ হয়ে ওঠে। তখন যে-কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে।

এক হাতে কুড়ুল আব জাল। আবতুল টুক কবে লাফিয়ে পড়ে শিকড়টাকে জাপটে ধরল আরেক হাত দিয়ে। কাদায় পা রাখার উপায় নেই। এঁটেল মাটি। একবার পা মাটিতে ব'সে গেলে আর রক্ষে নেই।

তরতর করে আবতুল শিকড় বেয়ে উপরে উঠে গেল। তারপর পাড় থেকে ফের কেওড়া গাছের কাণ্ড বেয়ে ওপরের দিকে। বিশাল গাছ। কিছুক্ষণ বাদে ডালপালার ভিড়ে আমি আর ওকে দেখতে পেলাম না।

ডিঙিতে চুপচাপ বসে আছি। আবতুলের সাড়াশব্দ নেই। পাখিদের কিচিরমিচির ডাক থেমে এসেছে। দিনের আলো একটু একটু করে নিভে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা খসখসে আওয়াজ। মুখ তুলে তাকালাম। দেখি—ছোটখাট কুমীরের মতো একটা জন্তু। দূরের

বাইন গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা মাড়িয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। গায়ের রং হলদে। তাতে কালো ছোপ ছোপ। কাচের গুলির মত চকচকে দুচোখ। সাপের মত লম্বা আর সরু জিভটা লকলক করছে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, আ-ব দু-ল—'

মানুষের গলার আওয়াজে ঘুমন্ত বন যেন জেগে উঠল। পাখির দল চিৎকার শুরু করে দিল। জন্তুটা হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার চোখে ওর চোখ। পলক ফেলতে পারছি না। এমন সময় ডালপালার আড়াল থেকে ঝটপট নেমে এল আবদুল। জলে একটা বিরাট সাইজের ছাইরঙা পাখি। মাটিতে পা দিয়েই সে ফিসফিস করে শুধোল, 'কি হয়েছে দাদাবাবু? চেঁচিয়ে উঠলে কেন?'

আমি হাত তুলে জন্তুটাকে দেখাতে আবদুল 'হুশ-হুশ' করে একটা শব্দ করল। অমনি জন্তুটা পেছন ফিরে বনের দিকে ছুট দিল। ডিঙিতে নেমে গলুইয়ের আড়ায় জাল সমেত পাখিটাকে প্রথমে বাঁধল আবদুল। তারপর বৈঠা হাতে তুলে নিয়ে বলল, ভাটা পড়েছে। তাড়াতাড়ি নদীতে পড়তে হবে দাদাবাবু।

আমার তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি ফিস-ফিস করে শুধোলাম, জন্তুটার নাম কি আবদুল ভাই? —জোরে বৈঠা চালাতে চালাতে আবদুল হেসে উঠল, 'ওটা তো তারকেল। মানুষে দেখলে বেজায় ভয় পায়।' বুঝলাম—জন্তুটা আসলে গেসাপ।

একটু বাদেই আবদুলের মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। আরেকটু এগুলেই নদী। হঠাৎ ধারালো গলায় বলে উঠল আবদুল, 'হেই দাদাবাবু। দ্যাখো, দ্যাখো—'

সামনের দিকে তাকালাম। দেখি খালের ওপর ঝুলে-পড়া একটা মোটা লতা জড়িয়ে জলের দিকে নেমে এসেছে মস্ত একটা ময়াল সাপ। সাপের মুণ্ডুটা জল থেকে হাত দুই উঁচুতে শূন্যে ঝুলছে। শুনেছি সুন্দরবনের ময়াল সাপ নাকি একটা আস্ত হরিণ কিংবা বুনো শূয়োরকে গিলে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে।

ডাঙায় উঠে যে বনের ভেতর দিয়ে নদীর পাড়ের দিকে যাব—সে পথও জানা নেই আমাদের। সব মিলিয়ে দারুণ বিপদ।

বৈঠা নামিয়ে লগি তুলে নিল আবছুল। তারপর আস্তে আস্তে ডিঙিটাকে ঝুলন্ত সাপের কাছাকাছি নিয়ে গেল। আমরা তখন ডিঙির এ-প্রান্তে। আবছুল এবার লগিটাকে কাদায় সজোরে গেঁথে দিয়ে বলল, 'দাদাবাবু, শক্ত করে লগিটাকে ধরে থাকতে হবে কিন্তু। হাত থেকে ছুটে গেলেই মারা পড়ে যাবে—'

বিপদে পড়লে মানুষের নাকি ভয় চলে যায়। আমারও সেই অবস্থা। জগা দত্তের আখড়ায় কুস্তি করা ছেলে আমি। আমার গায়ে তখন অসুরের বল। ছুই হাতে শক্ত করে লাঠিটা ধরলাম। যাতে ডিঙিটা এক চুল না এগোয়।

কুড়ুল হাতে আবছুল ডিঙির সামনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। সাপটা আবছুলকে কাছে আসতে দেখেই গর্জন-তর্জন শুরু করে দিল। সে কি ফোঁসফোঁসানি। মনে হচছে যেন একসঙ্গে হাজার খানেক হুইসেল বেজে উঠল। তারপর শুরু হল এক ভয়ানক লড়াই। সাপটা রয়েছে বেকায়দায়। ঝাঁপ দিয়ে যে নেমে পড়বে তার উপায় নেই। নামলেই জলে পড়ে যাবে। আবছুলও ঠিকমত ওকে আঘাত করতে পারছে না। এক একবার উঠে শূন্যে কুড়ুল চালাতে সাপটা সরে যাচছে। শেষ পর্যন্ত পরপর ছুবার সাপটার মাথায় কুড়ুলের ঘা পড়ল। মাথাটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। হার মানল ময়াল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে লতা ধরে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগল। সেই সুযোগে আবছুল তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে চলে এল। বৈঠা হাতে নিয়ে সে বলল, 'লগি ছেড়ে দাও দাদাবাবু।'—আমি হাত তুলে নিতে ডিঙি চলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে আমরা নদীর মুখে এসে পড়লাম।

ডিঙি থেকে বড় নৌকায় উঠেছি, ঠিক তখনই পশ্চিমে নদীর জলে লাল টকটকে সূর্যটা টুপ করে ডুবে গেল।

অবিনাশকাকা বললেন, 'ভাটা পড়ে গেছে। নৌকা ছাড়া যাচ্ছে না। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। এত দেরী হল কেন?'

অবিনাশকাকার কথার জবাব দেবার মত উৎসাহ নেই আমার। তপনদা জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি পাখি আবদুল? বেশ বড়সড় তো!'

'শামখোল।' —আবদুল উত্তর করতেই তমিজদ্দি বলে উঠল 'সে কি রে। শেষমেষ একটা শামখোল ধরে আনলি?'

'কি করব', জাল থেকে পা আর ঠোঁট চেপে ধরে পাখিটাকে বের করতে করতে বলল আবদুল, 'দাদাবাবু এমন চেঁচাল যে ভীমরাজ উড়ে গেল।'

'ওটাকে দিয়ে কি কাজ হবে। ছেড়ে দে।'—বিরক্ত গলায় বলল তমিজদ্দি।

অবিনাশকাকা বললেন, 'ঠিক আছে, রেখেই দাও না। নিরু যখন বলছে।'

আবদুল পাখিটার পায়ে দড়ি পরিয়ে ছইয়ের মাঝখানের বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। আমি নৌকার পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। পাশে তপনদা। আকাশের কোণে সরু একফালি চাঁদ উঠেছে। অসংখ্য তারা জ্বলছে নিভছে। একটানা বৈঠা বাওয়ার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ।

অবিনাশকাকা একসময় বার্মা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'সমশের, তোমার বাপও কি নৌকা বাইত?'

নৌকা তখন মাঝনদীতে। সমশের হাল ধরে বসেছিল। সে বলল 'আজ্ঞে কর্তা।'

'এখন নিশ্চয়ই অনেক বয়স হয়ে গেছে?'

সমশের বলল, 'বাপ কবে মরে গেছে। বড়মেঞার হাতে প্রাণটা গেছে—

'কি করে মরল? জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিল বুঝি?'

'না কর্তা', একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল সমশেরের বুক থেকে, 'এই রকম নৌকা থেকেই রাত্তির বেলা—'

বলো কি?—অবিনাশকাকা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'নৌকা থেকে নিয়ে গেল কি করে?'

আমি উঠে বসলাম। জঙ্গলের দিকে তখন প্রদীপের আলোর মত অসংখ্য আলো জ্বলছে। আসলে আবদুলকে জিজ্ঞেস করতে জানতে পারলাম, জঙ্গলে নাকি এক রকম বড় বড় পোকা আছে। রাতের বেলা তাদের গা থেকে জোনাকির মতই আলো বের হয়। আর ওই আলো দেখেই হরিণেরা বাঘের আক্রমণ থেকে পালাবার পথ খুঁজে নেয়।

সমশের ধীরে ধীরে তার বাবার মৃত্যুর ঘটনাটা বলতে লাগল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগলাম।

সমশেরের বাপ জলিল ছিল বন বিভাগের বড় বাবুর নৌকার মাঝি। সেই নৌকার মধ্যে ছিল কাঠের ঘর। যাকে বলে হাউস-বোট—অনেকটা সেই রকম। সেবার শহর থেকে বড়বাবুর বউ আর তার বাচ্চা ছেলে সুন্দরবনে এসেছিল বেড়াতে। কার্তিক মাসের রাত। নৌকা গোনা নদীতে নোঙর করা হয়েছে। রাত আটটা বাজতে না বাজতেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওরা সবাই ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। জলিল বাইরে। তামাক খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পাটাতনে শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল—কেউ যেন নৌকাটাকে ভীষণ জোরে দোলাচ্ছে। উঠে বসতেই জলিলের চক্ষুস্থির। দেখে বোট-ঘরের ওপরে বড় মেঞা। ভেতরে ঢুকবার পথ না পেয়ে চার পা দুদিকে ছড়িয়ে বোটটাকে দোলাচ্ছে। যাতে বোটটা কাৎ হয়ে ডুবে যায়। বড় মেঞা তখনো জলিলকে দেখতে পায় নি। সে ছিল পেছনের দিকে। বিশাল বাঘ। লম্বায় বার-তের ফুট তো হবেই। জলিল

দেখল পালাবার পথ নেই। জলে পড়লে বাঘও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেবে।

তখন সে আস্তে আস্তে নৌকার পাটাতনের এক একটা কাঠ খুলে ফেলতে লাগলো। বাঘ তখনো টের পায় নি। বেশ অনেকগুলো কাঠ তুলে ফেলে গলুইয়ের দিক থেকে ভেতরে ঢুকে পড়ল জলিল।

এমন সময় বড়মেঞা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর বোটের ছাদ থেকে মারল এক লাফঃ জলিলের পুরো শরীরটা তখন পাটাতনের ভেতরে ঢুকে গেছে। শুধু মাথাটুকু বাকি। শেষ রক্ষা হল না। বাঘ এসে এক থাবায় জলিলের ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিল। তারপর, হয়ত শরীরটাকেও টেনে বার করত। কিন্তু, ততক্ষণে বড়বাবুর বউ বাচ্চা জেগে গিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে। আর বড়বাবু জানলার একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে বন্দুকের নল টিপতে শুরু করে দিয়েছেন। গুলির আওয়াজ পেয়ে শেষপর্যন্ত শুধু জলিলের মাথাটা ছিঁড়ে নিয়েই বড় মেঞাকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল।

সমশেরের বলা শেষ হলে আমরা সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ রইলাম। এক সময় তপনদা বলে উঠল, 'বলো কি সমশের, বাঘের থাবার এত জোর—'

উত্তরটা দিল তমিজদ্দি, 'কি যে বলেন বাবু। শোনেন নি, বাঘের এক থাবায় মোষের মাথার খুলি পর্যন্ত গুঁড়িয়ে যায়।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ছইয়ের ভেতরে ঢুকলাম। আবদুল আমাদের বিছানা বেডিং বের করে নিয়ে এল। সোয়ারি খোপে বিছানা পাতা হল আমাদের তিনজনের। অর্থাৎ আমার, তপনদার আর অবিনাশ কাকার। উপর কোঠায় শোবে তমিজদ্দি, আবদুল ওরা। অবিনাশ কাকার ইচ্ছে—তমিজদ্দি এসে আমাদের পাশে শুয়ে পড়ুক। সে কথা শুনে তমিজদ্দি হেসে বলল, 'ভেতরে গিয়ে কি করব বাবু। এতো আর বনবাবুদের বোট নৌকা নয়। বড়মেঞা যদি আসেই—তাহলে গোল পাতার আগল ঠেলে সহজেই ভেতরে ঢুকে

যেতে পারবে। আমার কাছে তো বন্দুক আছে। তাছাড়া মাঝ রাত্তির থেকে আমরা পালা করে জাগব। ভয়ের কিছু নেই। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুম দিন।'

রাত বাড়তে শামখোল পাখিটা বিকট চেঁচাতে লাগল। আর মজার ব্যাপার, যেই পাখির চেঁচানি থামে অমনি বনের ভেতর থেকে 'ট্রিউ ট্রিউ, ট্রিউ ট্রিউ', করে হরিণের পাল ডেকে ওঠে। কখনো বা বাঁদরের দল চেঁচায়। শেষে এক সময় বুকের রক্ত জল করা বাঘের গর্জনও শোনা গেল।

বাঘের ডাক থেমে যেতেই তমিজদ্দি হাঁক পাড়ল, 'আবদুল শিগগীর গিয়ে পাখিটাকে ছেড়ে দে। নইলে মারা পড়বি।'

সে কথা শুনে তপনদা ছইয়ের আগল খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আবার কি হল তমিজ ?'

তমিজদ্দি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। রাতে শালখোল পাখি চেঁচালে বনের পশুরা নাকি জেগে ওঠে। তারা বোঝে—জঙ্গলের কাছে মানুষ ঘোরাফেরা করছে। সতর্ক হয়ে ওঠে। শামখোল পাখির চিৎকার তাই ওদের কাছে বিপদের সংকেত ছাড়া আর কিছু নয়।

তমিজদ্দির কথামত আবদুল পাখিটাকে ছেড়ে দিল। আশ্চর্য! সত্যি সেই রাতে আর একবারও আমরা কোন পশুর ডাক শুনিনি।

সুন্দরবনের নদীতে প্রথম রাতটা বেশ ভালই কাটল। তোফা ঘুম হয়েছিল। ছইয়ের বাইরে আসতে দেখি বেশ রোদ। আবদুল একটা বড় টিনের কৌটায় করে ডরা থেকে জল ছেঁচে নদীতে ফেলছে। অবিনাশকাকা আপন মনে দাঁত মাজছে। আর তপনদা সামনের দিকে বসে।

সকালবেলার নদীর দুধারের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঁয়ে শান্ত বনভূমি। গাঢ় পশমের মত রোদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

ডাইনে আবাদের জমি। নদীর ধার ঘেঁষে উঁচু মাটির বাঁধ। এই সব বাঁধকে বলা হয় ভেড়ি।

কিছুটা এগুতে দেখি আবাদের দিকে এক জায়গায় মানুষের ভিড়। কিছু লোক নদীর পাড় ধরে লাঠি সড়কি হাতে ছোটাছুটি করছে। কি ব্যাপার? আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম।

নৌকা ওদের দিকে এগুতে নদীর পাড় থেকে কয়েকটা লোক হাত নেড়ে আমাদের ডাকতে লাগল।

অবিনাশ কাকা হুকুম করলেন, 'সমশের নৌকো পাড়ে ভিড়াও।'

তপনদা বলল, 'বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে লাভ কি। যত তাড়াতাড়ি দত্তর গাংএ পৌঁছুনো যায় ততই মঙ্গল।'—কিন্তু কে তপনদার কথা শোনে। অবিনাশ কাকার বড়ো জিদ। তার কথায় নৌকা পাড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

নদীর পাড়ে কিছুটা জায়গা জুড়ে হোগলার বন। তার পরেই মেছো ঘেরি। মানে মাছ চাষের জলাশয়।

নৌকা পাড়ে ভিড়তে কয়েকজন লোক ছুটে এল। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে বন্দুক আছে বাবু?'

বন্দুক বের করে পাড়ে নামতে নামতে বললেন অবিনাশকাকা, 'কি ব্যাপার?'

আমি আর তপনদাও নেমে পড়লাম। মেছোঘেরির দিকে এগুবার সময় ঘটনাটা জানলাম। শীতকাল। নদীর জল শুকিয়ে যায় বলে মাছ ধরা কঠিন। তাই কুমীরেরা এই সময় ডাঙার দিকে হাত বাড়ায়। কখনো কখনো উপরে উঠে খুঁটোয় বাঁধা গরু ছাগল টেনে নিয়ে চলে যায়। কখনো বা মেছো ঘেরিতেও হানা দেয়। ঘেরিতে প্রচুর মাছ। জল অল্প। তাই শিকার ধরতে পরিশ্রম হয় না। এমনি একটা কুমীর বাঁধের এক দিক দিয়ে ঘেরির ভেতরে ঢুকেছে।

কিছুটা এগিয়ে যেতে দেখলাম এক দারুণ দৃশ্য। বাঁধের ওপরে কুমীরের অর্ধেকটা শরীর। আর অর্ধেকটা জলে। চারপাশ থেকে

কুমীরটা নিরুপায় হয়ে বিরাট হাঁ করে আমাদের দিকে ছুটে এল।
অবিনাশ কাকা বন্দুক বাগালেন। (পৃ : ৩৭)

লোকজন লাঠি সড়কি ছুঁড়ছে। কুমীর হুংকার ছেড়ে লাফ দিয়ে পড়ল সামনের বাদায়। কুমীরটা আমাদের থেকে গজ পঞ্চাশেক সামনে। পেছন থেকে লোকেরা 'মার মার' শব্দে ছুটে আসছে। হোগলাবাদায় তেমন জল নেই। পেছনে গাঁয়ের লোক। সামনে আমরা। কুমীরটা নিরুপায় হয়ে বিরাট হাঁ করে আমাদের দিকে ছুটে এল। মস্ত বড় কুমীর। লেজের ঝাপটায় হোগলা বনে যেন ঝড় বয়ে গেল। অবিনাশ কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তপন নিরু,—তোমরা আমার পেছনে চলে যাও।'—কয়েকটা মুহূর্ত। অবিনাশ কাকা বন্দুক বাগালেন। আর মাত্র দশ হাত দূরে কুমীরটা। নিশানা ঠিক হলে অব্যর্থ মৃত্যু। এমন সময় গুড়ুম গুড়ুম শব্দে দুবার অবিনাশ কাকার বন্দুক গর্জে উঠল। আমরা চোখ মেলে তাকাতে দেখি—হোগলার জঙ্গল থেকে আগ্নেয়গিরির লাভার মত কাদার চাপড়া শূন্যে উঠে আসছে। আর জন্তুটা তখন কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। অবিনাশ কাকার টিপের তুলনা নেই। কুমীরের ঠিক গলার নিচের নরম মাংসে গুলি দুটো ঢুকে গিয়েছিল।

ফেরার সময় অবিনাশ কাকা একটাও কথা বললেন না। হাত পা ধুয়ে নৌকায় উঠে একটা বার্মা চুরুট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নৌকা ছাড়ো সমশের।'

রাতভর মাছ ধরে একদল জেলে-ডিঙি ফিরছিল। তপনদা হাঁক পাড়ল, 'মাছ হবে নাকি গো?'

সমশের বাধা দিল, 'মাছ কিনবেন কেন বাবু। নৌকোয় জাল আছে। সামনে খাল। কয়েকটা খ্যাও দিলেই—'

তপনদা ওর কথা কানে তুলল না। হাত নেড়ে একটা ডিঙিকে কাছে আসতে বলল।

ডিঙি কাছে আসতে ডজনখানেক বড় সাইজের গলদা চিংড়ি কেনা হল।

কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর সমশের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও নেতাই, জোরে বৈঠা চালা। কিনারায় ভিড়ব।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল তপনদা 'আবার কিনারায় কেন?'

'জোয়ার এল যে বাবু। আর এগুনো যাবে না।'

সূর্য মাথার ওপর উঠে আসতে তখনো কিছু বাকি। নিরুপায় তপনদার মুখটা থমথমে হয়ে উঠল। জোয়ারের জন্য তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে না।

পাড়ের কাছাকাছি নৌকা নোঙর করা হল। মাদারদহ থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়া হয়েছে। বেশি করে সঙ্গে কাঠ আনা হয়নি। ঠিক হল—পালান আর নিতাই নৌকার দুই মাঝি কাঠ আনতে জঙ্গলে যাবে। ওদের সঙ্গে দুটো চটের থলি নিয়ে আবদুলও ডিঙিতে চেপে ইশারায় আমাকে ডাকল। আমি সমশেরের দিকে তাকালাম। সমশের আমার মনের ভাবটা ধরতে পেরে হেসে ফেলল, 'যাও না দাদাবাবু। তুমিও আবদুলের সঙ্গে ঘুরে এসো।'

এবার তপনদা বেঁকে বসল, 'না না ও যাবে কি। নিরু তুই নৌকোতেই থাক।'

সমশের সাহস দিল, 'ভয়ের কিছু নেই বাবু। ছোট জঙ্গল। এখানে বড়মেঞা নেই।'

আমি প্রায় লাফিয়ে ডিঙিতে চেপে বসলাম। আগের দিন জঙ্গলে ঢোকার পর থেকে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছিল।

ডাঙায় উঠে দেখলাম—জায়গাটা সত্যি ছোট। ওপার দেখা যায়। দ্বীপটায় জঙ্গলও খুব ঘন নয়। মাটি থেকে কয়েকটা কেওড়া ফল তুলে নিয়ে আবদুল আমাকে খেতে দিল। খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিতে দেখি স্বাদ মন্দ নয়। টক্ টক্। একটা গরাণ গাছের ঝাড়ের দিকে ছুটে গেল আবদুল। গাছগুলো খুব উঁচু নয়। বড়জোর দশ-বারো ফুট হবে। সবুজ আর পুরু গোল গোল পাতা। গাছের ছালে হাত ঘষতে দেখি অবাক কাণ্ড। আবদুলের হাত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ডাঙা পেয়ে আমরা দুজনে আনন্দে ছোটাছুটি করতে

লাগলাম। গাছ থেকে কয়েকটা বুনো লেবু ছিঁড়ে পকেটে পুরলাম। ততক্ষণে নিতাই আর পালান কুড়ুল হাতে একটা কেওড়া গাছে উঠে গেছে।

কিছুটা এগুতে দেখি একটা গাছে বাতাবী লেবুর মত একরকমের ফল ঝুলছে। একটা পেড়ে নিয়ে দুজনে ফুটবল খেলতে শুরু করলাম। এক সময় ফলটা ফেটে যেতে আবদুল একটা ডালপালাওলা ঝাঁকড়া গাছের দিকে ছুট দিল। আমি পেছু নিলাম। গাছতলায় পৌঁছে চাপা গলায় আবদুল বলল, 'দেখেছ দাদাবাবু, গাছে কত ফুল। নিশ্চয়ই এদিকে মৌচাক আছে।' মুখ তুলে তাকালাম। দেখি সত্যি হলুদ রঙের ফুলে গাছটা ছেয়ে আছে। আমরা ততক্ষণে দ্বীপের অনেক ভেতরে চলে এসেছি। পালান নিতাই কাউকেই আর তখন দেখা যাচ্ছে না।

আমি আনন্দে নেচে উঠলাম, 'মৌচাক ভাঙ্গবে। কি মজা!'

চটের থলিদুটো তুলে ধরে হাসল আবদুল, 'আমি নৌকো থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। এ জঙ্গলে মৌচাক আছে। হলুদ ফুলের মধু খেতে যা মিষ্টি—'

কয়েক পা এগুতে দেখি একটা গাছের মগডালে মস্ত বড় একটা মৌচাক। আবদুল একটা থলি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ঝটপট গায়ে জড়িয়ে নাও দাদাবাবু। মৌমাছির হুলে দারুণ জ্বালা।'

কথা শেষ করেই ও গাছটায় উঠে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যে মৌচাকের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হাতকয়েক দূর থেকে ডাল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'শিগগির চটের থলিটা দিয়ে মাথা ঢেকে নাও দাদাবাবু।' ততক্ষণে চাকের ভেতর থেকে মৌমাছির দল বেরুতে শুরু করেছে।

ঝপাং! একটু বাদেই চাকটা এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। হাজার হাজার মৌমাছি নিচের দিকে নেমে আসছে। ওদের গুনগুন্

শব্দে আমার কান ঝালাপালা। থলির ভেতর থেকে মুখ বের করতে পারছি না।

একটু পরেই আবদুল নেমে এল। চাকটা তুলে নিয়ে বেশ করে ঝাঁকিয়ে বলল, 'ছোটো দাদাবাবু।'

আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে এব সময নদীর ধারে এসে পৌছুলাম। ততক্ষণে মৌমাছিব দঙ্গল আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। চটের ভেতব থেকে মাথাটা বের করে নদীর দিকে তাকাতে বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল। চিঁচি শব্দে বলে উঠলাম, 'এ-কি আবদুল নৌকো কোথায়।'

আবদুল হেসে বলল, 'ভয় নেই দাদাবাবু। আমরা জঙ্গলের দিকে চলে এসেছি।'

'তাহলে, এখন কি হবে?'—কান্না পাচ্ছিল আমাব।

আবদুল চড়া গলায় বলল, 'কি আবাব হবে। আমবা ওধারে যাব। জঙ্গলে ঢুকলে এত ডর করলে কি চলে!'

অগত্যা ফের আমরা বনের পথ ধরে এগুতে লাগলাম। আবদুল সাহস জোগালেও আমার বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছিল। শেষ-পর্যন্ত বিপদে পড়ে গেলাম না তো।

না বাঘ-টাঘ নয়, জন্তুটা প্রথমে আমার চোখে পড়ল। বেশ কিছু দূরে মাটি খুঁড়ছিল। বিরাট লম্বা। চার পাঁচফুট তো হবেই। এক বুক সমান উঁচু। বুনো শুয়োর আর কি। কালোর সঙ্গে অল্প লাল মেশালে যেমন হয় তেমনি গায়ের রং। ঘাড় আর বুকের দিকে বড় বড় লোম।

'স্-স্-স্' করে একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়তে আমি ফিস ফিস করে বললাম, 'দেখেছ আবদুল—'

'আই বাপ্।' —সেদিকে চোখ পড়তে আবদুল চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটা সেদিকে মুখ তুলে তাকাল। কুঁতকুতে চোখে কয়েক

পলক তাকাল আমাদের দিকে। ধীরে ধীরে ওর ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। ঘড়ঘড় করে শব্দ করতে বড় সাইজের ধারালো ছুরির মত ছু' পাটি দাঁত বেরিয়ে এল। সামনের ছু পা ভেঙে জন্তুটা মাথা নিচু করতেই মৌচাকটা মাটিতে ফেলে দিয়ে।চিৎকার করে উঠল আবছুল, 'শিগগীরই গাছে উঠে পড়ো দাদাবাবু।'

পেছনেই একটা গামুর গাছ। আমরা লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে ফেললাম। জন্তুটা ততক্ষণে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। বড় একটা ডাল ধরেছি সবে, এমন সময় গাছটা দারুণ জোরে কেঁপে উঠল। আর একটু হলে হাত ফস্কে নিচে পড়ে যেতাম। ধাঁ করে একটা হাত ধরে আবছুল আমাকে ওপরের দিকে তুলে নিল।

জন্তুটা আবার কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ওর ধারালো দাঁত থেকে লালা ঝরছিল। ফের মাথা নীচু করে সশব্দে ছুটে এল। গাছের গুঁড়িতে প্রবল জোরে ধাক্কা মারল। এইভাবে চলতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ। এদিকে সূর্য মাথার ওপর থেকে বেশ কিছুটা সরে গেছে। শুয়োরটা বার বার ছুটে আসছে। গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরেই যাচ্ছে। এক সময় ওর মাথা ফেটে রক্ত গড়াতে লাগল। তবু ছুটে আসছে, আসছেই। কি ভীষণ রাগ।

আবছুল গলার স্বর চড়িয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। ওটা সংকেত। জঙ্গলে মানুষ বিপদে পড়লে এই রকম শব্দ করে।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত পালান আর নিতাই এসে পড়ায় আমরা রক্ষা পেলাম। দূর থেকে নিতাই জন্তুটার দিকে কুড়ুল ছুঁড়ে মারল। গায়ে অবশ্য লাগল না। কিন্তু বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিল। ডানদিকের গোলপাতার ঝোপের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নৌকায় ফিরে স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর আরেক মজা। পালান আমাদের এঁটোকাঁটা নদীর জলে ফেলতেই কোত্থেকে এক পাল হাঙর

ছুটে এল। এগুলি অবশ্য সমুদ্রের হাঙরের মত বিশাল নয়। তবে একেবারে ছোটও বলা যায় না।

আবদুলরা বলে “কামোট”। আমরা মজা পেয়ে গেলাম। আগের দিনের কিছু পান্তাভাত ছিল। সেগুলো মুঠো মুঠো করে জলে ফেলতে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড। কামোটগুলো হাঁ করে ছুটে জলের ওপরেই মুখ তুলছে। এদের দাঁতগুলো মাড়ির তলায় থাকে। একটু চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী। দাঁতগুলো করাতের চেয়েও ধারালো। গ্রামের লোকেরা নদীতে নেমে স্নান করার সময় ওই ধারালো দাঁতগুলো দিয়ে পা কামোটেরা পর্যন্ত কেটে নিয়ে চলে যেতে পাবে। জলে থাকার সময় মানুষ নাকি তা টেরও পায় না।

নৌকা চলছে। শীতের সোনালি দুপুর। আমরা সবাই ছইয়ের বাইরে। এখন দুধারে ঘন বন। অপরূপ দৃশ্য। এমন কি ঘুম-কাতুরে অবিনাশ কাকাও আমাদের পাশে বসে।

তপনদা কেন কিছুই দেখছিল না, তার মাথায় একটাই চিন্তা। কবে বঙ্গদুনীতে পৌঁছুবে। তপনদা শুধু বলল, ‘দত্তর গাং আর কতদূর সমশের?’

সমশের উত্তরে বলে, ‘এখনো অনেকটা পথ বাবু। আরো একটা দিন লাগবে।’

খুশি হয় না তপনদা, ‘আরো একটা দিন। বলো কি!’

অবিনাশ কাকার চোখে দূরবীন। এক সময় তিনি ডাকলেন আমাকে। ‘এই নিরু, এদিকে এসো। দেখে যাও মজা।’

আমি এগিয়ে গেলাম, ‘কি?’

দূরবীনটা চোখে দাও। দেখতে পাবে। মুচকি মুচকি হাসছিলেন অবিনাশ কাকা।

সত্যি অবাক কাণ্ড। এ দৃশ্যের তুলনা নেই। আমাদের বাঁয়ে একটা বড় দ্বীপ। পাড় বেশ চওড়া এবং পরিষ্কার। দেখি হরিণের

পিঠে বানর বসে আছে। একটা নয়, পর পর অনেকগুলি। তারপর এক সময় শুরু হয়ে গেল দৌড়। ঘোড়ায় চেপে মানুষ যেমন ছোটে তেমনি সাঁ-সাঁ করে হরিণগুলো নদীর পাড় ধরে ছুটছে। আর বাঁদরগুলি তাদের পিঠে নাচানাচি করছে।

পরে তমিজদ্দির কাছে শুনলাম সুন্দরবনে বাঁদর আর হরিণের মধ্যে নাকি খুব বন্ধুত্ব। বাঁদর আছে বলেই হরিণেরা অনেকটা নিশ্চিন্তে আছে। নইলে কবে ওরা সব বাঘের পেটে চলে যেত। বাঁদর গাছের ডালে বসে সব লক্ষ করে। দূরে বাঘ দেখতে পেলেই চেঁচামেচি করে হরিণদের সতর্ক করে দেয়। আর তখন হরিণের পাল চোঁ-চা ছুট মারে। হরিণের সঙ্গে দৌড়ে বাঘ পারে না। শুধু কি তাই। কেওড়া গাছের পাতা আর ফল হরিণের খুব প্রিয়। বাঁদরেরা নাকি তাদের সে সব দেয়। গল্পের চেয়েও মজার বলে মনে হল। বনের পশুদের মধ্যে যে এত মিতালি আছে—তা জানতাম না আমি।

সেদিন রাতে দু'দুবার আমরা ডাকাতদলের মুখোমুখি হয়েছিলাম। একবার সন্ধ্যার কিছু পরে। আরেকবার বেশ রাত্তিরে। প্রথমবার আমরা সবে বড় নদী থেকে একটা খালের ভেতরে ঢুকেছি—এমন সময় জঙ্গলের দিক থেকে টর্চের জোরালো আলো এসে কয়েকবার নৌকার ওপর পড়ল। নদীতে অনেক দূর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়। কিছুক্ষণ বাদে পাড় থেকে গম্ভীর গলায় কেউ একজন হাঁক পাড়ল, 'কে যায় রে?'

সঙ্গে সঙ্গে তমিজদ্দি উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে জবাব দিল, 'আমি।'

আমি আবদুলকে শুধোলাম, 'কে ডাকছে আবদুল?'

আবদুল জবাব দিল, 'চুপ করো দাদাবাবু। ডাকাত—'

পাড় থেকে ফের প্রশ্ন, 'আমি কেডা ?'

তমিজ্জদ্দি উত্তর করল, 'আমি ডুমুরখালির কলি বাউলের ছেলে তমিজদ্দি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ফের শোনা গেল, 'আচ্ছা যাও।'

নৌকা আবার নদীতে পড়লে তমিজদ্দি বলল, 'ঝট্‌পট্‌ আপনারা খাওয়া সেরে নিন বাবুরা। এদিকটা ভাল নয়। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে ফেলতে হবে।'

সুন্দরবনে রাত্রিবেলা আলো জ্বালিয়ে নৌকা চালানো ভয়ের। যে কোন সময়ে ডাকাতের দল হানা দিতে পারে।

সাততাড়াতাড়ি খাওয়ার পাট চুকিয়ে ছইয়ের ভেতরে ঢুকে আমরা আলো নিভিয়ে দিলুম।

মাঝরাত্তিরে আবার তমিজদ্দির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। তমিজদ্দি বলছিল, 'কি চাও তোমরা ?'

—এবার আওয়াজটা নদীতেই, 'আগুন আছে ? একটু দেবে নাকি। তামাক ধরাব।'

আগুন চাইবার নাম করে নৌকায় যে ডাকাতি হয় একথা আমি বইতে পড়েছি। তমিজদ্দি জবাব দিল, 'রাত-বিরেতে আমারা আগুন দিই না।'

ততক্ষণ আমি আর অবিনাশকাকা বাইরে বেরিয়ে এসেছি। আবছা চাঁদের আলোয় দেখলাম—সামান্য কিছুদুরেই দু'খানা নৌকা। তমিজদ্দির কথা শেষ হতেই ওধার থেকে একজন হুঙ্কার ছাড়ল, 'আগুন তোকে দিতেই হবে। নৌকা থামা বলছি—'

তমিজদ্দি চাপা গলায় বলল, 'বাবু একখানা বন্দুক বার করেন।'

অবিনাশকাকা ভেতরে ঢুকবার আগেই বন্দুক হাতে তপনদা বেরিয়ে এল। ততক্ষণে নৌকাদুটো দুদিক থেকে আমাদের ঘিরে

…ওধাব থেকে একজন হুঙ্কাব ছাড়ল—আগুন তোকে দিতে ইহবে।

…অবিনাশ কাকা ভেতরে ঢুকবার আগেই তপনদা বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল।

(পৃ : ৪৯)

ধরেছে। তমিজদ্দি চেঁচাচ্ছে, 'সাবধান, আমি ডুমুরখালি কলি বাউলের ছেলে।'

নৌকা দুটো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। পাটাতনে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। হাতে কুড়ুল, বর্শা, লাঠি। একদল বলে উঠল, 'মার ব্যাটাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হই হই করে উঠল। ওদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হবার আগেই তপনদার বন্দুক গর্জে উঠল, 'গুড়ুম—গুড়ুম।'—তমিজদ্দি হুংকার ছাড়ল, 'আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। আর কাছে আসবি তো শেষ করে দেব।'

বন্দুকের শব্দে নৌকা দুটো পেছিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ বাদে তমিজদ্দি মুখ খুলল, 'অবস্থা ভাল বুঝছি না বাবু।'

পরের দিন বেলা করে ঘুম ভাঙল। ছইয়ের বাইরে এসে দেখি দুধারের গাছগাছালির মাথায় সে গাছের মধ্যে এক খণ্ড মেঘ উঁকিঝুঁকি মারছে। আকাশ ঘোলাটে। নদীর জলে বেশ ঢেউ। বাতাস বইছে জোরে। পাল খাটানো হয়েছে। নৌকা বেশ তর তর করেই এগুচ্ছে।

আমাকে দেখে হাসি হাসি মুখ করে তপনদা বলল, 'বুঝলি নিকু, এটাই দক্ষিণের গাঙ'

কিছুটা এগুবার পর এক পাড়ে দেখলাম নৌকার সারি। জঙ্গলের দিক থেকে মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছিল। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করতে তমিজদ্দি সব খুলে বলল। মাঝে মাঝে জঙ্গল বেড়ে গেলে সরকারের বনবিভাগ কাঠুরেদের জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটবার হুকুম দেয়। একে বলে 'ঘের'।

তপনদা চেঁচিয়ে প্রশ্ন করছিল, 'মাঝি, আমরা গোসাবা নদীতে কখন পড়ব?'

সমশের জবাব দিল, 'বাতাস না পড়ে গেলে আর ঘণ্টাদুই লাগবে। সামনেই—'

তমিজদ্দির মুখ থমথমে। সে বলল, 'পুবালি বাতাস বাবু। বন্যার ভয় আছে। এ বাতাস না পড়লে কিন্তু আমরা বিপদে পড়ে যাব।'

তমিজদ্দির কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই তপনদার। সে আবার চেঁচাল, 'মায়দ্বীপের কাছে কখন পৌঁছুব সমশের?'

'মায়াদ্বীপ', পালানের হাত থেকে হুঁকো নিতে নিতে বলল সমশের, 'সে তো অনেক দূর। আজ বড় জোর চামটার কাছাকাছি যেতে পারব।'

বাঁদিকে একটা খাল। হঠাৎ খালের ভেতর থেকে সাঁ করে একটা নৌকা এসে দত্তর গায়ে পড়ল। ছোট ডোঙা। আমাদের পানসী থেকে গজ কুড়ি দূরে। নৌকার মাঝি হাঁক পাড়ল, 'কোনদিকে যাচ্ছ?'

'এখন গোসাবা নদীর দিকে যাচ্ছি—', সমশের উত্তর করল, 'যাব অনেক দূর—'

'কোথায়?'

'সমুদ্দুরের কাছে। ভাঙাডুনা দ্বীপে।'

ছইয়ের ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। মাথায় গামছা জড়ানো। লম্বাটে মুখ। বলল 'তা ভাঙাডুনায় যাবে, গোসাবা নদী দিয়ে যাচ্ছ কেন। ডান দিকে খাল দিয়ে চলে গেলেই তো পারো।'

লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। চেনা-চেনা মনে হল। তপনদাও দেখলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছে।

'দরকার কি। হাওয়া আছে। বাদাম খাটিয়েছি। ঝটপট নৌকা এগুবে।'—সমশেরের কথায় মনে হল লোকটার কথা শুনে ও বিরক্ত বোধ করছে।

নিচু গলায় তপনদা বলল, 'শিগগীর ভেতর থেকে দূরবীনটা নিয়ে আয় তো নিরু।'

লোকটা আবার বলল, 'না, বলছিলাম কি—তুফান আসতে পারে। বড় গাঙ। তাছাড়া সময়ও তো বেশি লাগবে।'

তমিজদ্দি লোকটার কথায় সায় দিল, 'কর্তা তো ঠিকই বলেছেন সমশের। নৌকা খালের দিকে নিয়ে চলো—'

সমশের ধমকে উঠল, 'যা বোঝ না বাউলে, তা নিয়ে বক বক করতে এসো না। আমি ঠিকই যাচ্ছি।'

দূরবীনটা তপনদার হাতে দিয়েছি। লোকটা বোধ হয় বুঝে ফেলেছে। আমাদের উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে ছইয়ের ভেতর ঢুকে পড়ে মাঝিকে কি যেন বলল। তারপর অবাক কাণ্ড। নৌকাখানা ফের বাঁদিকের খালে ঢুকে পড়ল।

মুখ তুলে তাকাতে দেখি—তপনদার চোখে-মুখে যেন কালো মেঘ নেমেছে।

গোসাবা নদীর মুখে এসে বুকের ভেতরটা ছমছম করে উঠল। কি বিরাট নদী। আকাশভরে অকালে মেঘ। বড় বড় ঢেউ ফুঁসছে। নদীর অপর পাড়ে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টার ওপর সময় লাগল।

পাড়ের কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে সমশের বলল, 'ও নেতাই, কলসী-গুলো বের কর। জল নিতে হবে।'

জোয়ার চলছে। তমিজদ্দি বলল, 'পালে যখন হাওয়া ধরছে—আর একটু এগুলে হত না সমশের।'

সমশের তেতে উঠল, 'না। এখানে বাঁওড় আছে। এরপর কি আর কোথাও নামা যাবে। এরপর সব জায়গাই তো গরম।'

বাঁওড় মানে বিল। সুন্দরবনের দ্বীপগুলির মধ্যে এরকম অসংখ্য মিষ্টি জলের বাঁওড় আছে। তপনদাও বিরক্ত হল। বলল, 'বারবার এভাবে থেমে সময় নষ্ট করা আমার ভাল লাগছে না।'

সমশের তপনদাকেও রেয়াত করল না। হাল ছেড়ে দিয়ে গজগজ করে উঠল, 'আপনারা যখন এতই বোঝেন তখন আর আমি কেন এখানে বসে আছি—'

ঝগড়া বাধার মুখে দুহাত তুলে অবিনাশ কাকা সবাইকে শান্ত করতে চাইলেন, 'আহা, তোমরা চুপ করবে। সুন্দরবনের ভেতর ঢুকে নিজেদের মধ্যেই যদি কথা কাটাকাটি করো—'

সমশেরের রাগ পড়ল। সে বললে, 'এই কথাটা বাউলকে আর বাবুকে বুঝিয়ে বলুন কর্তা। আমি হাল যখন ধরেছি তখন আমার কথাই শুনতে হবে সবাইকে।'

বাঁওড় থেকে জল নিয়ে নৌকায় আসতে ভাটা পড়ল। পাল নামিয়ে সমশের বলল, 'জোরে বৈঠা চালা পালান—'

সে রাতে চামটা ছাড়িয়ে একটা খালে ঢুকে নৌকা নোঙর করা হয়েছিল। আর সেই ভয়ংকর রাতেই অ মহা অকালে ভেসেছিলাম।

তপনদার দুশ্চিন্তা যে কতখানি সত্য তা আমরা সকাল হতেই টের পেয়েছিলাম। রাতে, আমরা যখন সবাই গভীর ঘুমে, তখন কে বা কারা এসে আমাদের নৌকার নোঙর খুলে দিয়েছিল। তারপর সারারাত নদীর তীব্র স্রোতের টানের নৌকা ভাসতে ভাসতে আমরা একেবারে উল্টোদিকে চলে গিয়েছিলাম।

দারুণ বিপদের মধ্যে পড়ে গেলাম। নৌকা দিশেহারার মত জলে ভাসতে লাগল। বিপদ যেন আমাদের পেছু নিয়েছিল। নইলে শীতকালে এমন দুর্যোগ হবে কেন। জোর হাওয়া দিচ্ছিল। নদীর জলে সে কি টান। বড় বড় রাক্ষুসে ঢেউ। দিনে সূর্য আর রাতে তারা দেখে যে সঠিক পথে নৌকা এগুবে তার উপায়ও নেই। সব সময় আকাশ কালিমাখা মেঘে ঢাকা। আর দুধারে ডাঙা, সে-ও দেখতে একই রকমের। নদীর ধার ঘেঁষে গোল গাছের সার। তারপর গরাণ, গেঁয়ো আর কেওড়া গাছের নিবিড় জড়াজড়ি। সুন্দরবন তমিজদ্দির আঁতিপাতি করে চেনা। কিন্তু তারও মুখ ভার। সে দেখে বলে, 'মেঘ সরলে আন্দাজ করতে পারতাম, নৌকা কোনদিকে যাচ্ছে।'

ওই ক'দিন তপনদার মুখও ছিল থমথমে। সেটা শুধু দিক-ভুল হবার জন্য নয়, তপনদার আসল দুশ্চিন্তা অন্য কারণে। তার আভাসও পেয়েছিলাম একদিন। নিশুতি রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে পাশ ফিরে দেখি তপনদা নেই। আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তপনদা—'

ছইয়ের বাইরে থেকে ওর চাপা গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'আমি এখানে।'

গুটিসুটি মেরে অবিনাশ কাকাকে ডিঙিয়ে বাইরে চলে এলাম।

তপনদা বলল, 'একটা কথা কি তোর কখনো মনে হয়েছে নিরু ?'

'কি কথা ?—আমি ওর গা ঘেঁষে বসলাম।

তপনদা সরসর শব্দে খানিকটা নস্যি নাকে চালান করে দিয়ে বলল, 'আমরা, বুঝলি, ক্রমশ একটা ভয়ংকর চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ছি।'

'কি রকম ?'—আমার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

চারদিকে যেন কেউ আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। নদী, জঙ্গল, আকাশ কিছুই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। তপনদা নড়েচড়ে বসল, 'আমার কি মনে হয় জানিস নিরু, কিছু লোক আমাদের পেছু নিয়েছে—'

'একথা বলছ কেন ?' —প্রশ্ন করলাম।

তপনদা জবাব দিল, 'কলি বাউলের ছেলে তমিজ। বাদা অঞ্চলের ডাকাতেরা এক ডাকে ওকে চেনে। ও নিজের পরিচয় দেবার পরেও একদল লোক আমাদের নৌকা আক্রমণ করেছিল। এর কারণটা কি বলতে পারিস ?'

তপনদার গলার আওয়াজ ভারি হয়ে উঠল, 'আমার মনে হয়—ওরা ডাকাতই না। এসেছিল আমাদের খুন করতে।'

আমি বললাম, 'তাহলে ওই দলটাই রাতের বেলা আমাদের নৌকার নোঙর খুলে দিয়েছিল, তাই না ?'

তপনদা বলল, 'ঠিক ধরেছিস তুই।'

কিন্তু আমি অল্প থেমে প্রশ্ন করলাম, 'আমাদের খুন করে ওদের লাভ?'

তপনদা জবাব দিল, 'লাভ কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা কি এখন খুলে বলব না তোকে। পরে বলব।'

আমি আর একটা কথা জানতে চাইলাম, 'কিন্তু সবশেষে যে লোকটা আমাদের গোসাবা নদীর দিকে না গিয়ে ডানদিকের খালে ঢুকতে বলেছিল তার মতলবটা কি?'

'মতলব', খুক করে একটু কেশে নিল তপনদা, 'খারাপ ছিল না হয়ত। ওই লোকটার কথা শুনলে আমাদের এই বিপদ হত না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার মুখ খুলল তপনদা, 'আমার আসল ভয়টা কোথায় জানিস নিরু—'

'কোথায়?'

'এই নৌকাতেও আমাদের শত্রুপক্ষের একজন লোক রয়েছে।'

'কে সে?'

'এখন নয়, সময় হলে বলব।'

'আমি জানি।'

'কে বল তো?'—তপনদা আমার দিকে ঘুরে বসল।

'বলব, সময় হোক।'—আমি মুচকি হাসলাম।

চারদিন চার রাত এইভাবে কেটে যাবার পর একদিন ভোর ভোর 'হেড়েভাঙা, হেড়েভাঙা' বলে তমিজদ্দি বিকট চেঁচিয়ে উঠতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল।

বাইরে আসতে দেখি অপরূপ দৃশ্য। আকাশে একঝাঁক বড় পাখি গোল হয়ে ঘুরছে। এক ফোঁটা মেঘ নেই। বাঁদিকে ঘোর বনভূমি। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল। সেই জলে যেন কেউ

ফিকে নীল রং গুলে দিয়েছে। আর পুব-দক্ষিণ কোণায় জলের অতল থেকে লাল টকটকে সূর্যটা উঁকি মারছে।

আমাদের দেখেই তমিজদ্দি বলে উঠল, 'যা ভয় পেয়েছিলাম তা-ই হয়েছে বাবু। আমরা সুন্দরবনের পুবে চলে এসেছি।'

তারপর সব খুলে বলল তমিজদ্দি। নোঙর খুলে দেওয়ায় রাতে জোয়ারের স্রোতের টানে নৌকা গোসাবা নদী থেকে আঠার বাঁকা নদীতে ঢোকে। তারপর বৈকুণ্ঠের খাল এবং গরাণকাঠি খাল ধরে আমরা এসে পৌঁছেছি হাড়িয়াভাঙা নদীতে। যেদিকে আমাদের যাবার কথা তার একেবারে উল্টোদিকে।

তপনদার মুখে কালো ছায়া নামল। সে শুধালো, 'এখান থেকে বঙ্গদুনী কতটা পথ তমিজভাই?'

তমিজদ্দির উত্তর করল, 'দিন তিনেক তো লাগবেই।'

'এ্যাদ্দিন?'—তপনদা মনমরা হয়ে গেল, তাহলে তো শুভকে বাঁচানো মুস্কিল হয়ে পড়বে।'

কাঁড়াল থেকে সমশের বলে উঠল, তা আর কি করবেন কর্তা। এ তো ডাঙার পথ নয় যে ছুটে চলে যাবেন।'

সামনের দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'বাব্বা, কি বিশাল নদী। ওপার দেখাই যাচ্ছে না।

অবিনাশ কাকা হাসলেন, 'দূর বোকা। আমরা তো হাড়িয়াভাঙার মোহনায় এসে গেছি। ও তো সমুদ্র। বে অফ বেঙ্গল—

'তাই নাকি, বঙ্গোপসাগর।'—আমি সমুদ্রের দিকে তাকালাম।

আবদুল আমার কাছে এসে বলল, 'দেখছ দাদাবাবু—

'কি?'—আমার প্রশ্ন শেষ হতেই ও ইশারায় আমাকে ডাঙার দিকে তাকাতে বলল। সেদিকে চোখ ফেরাতে দেখি অজস্র ছোটবড় রং-বেরং-এর ঝিনুক পড়ে আছে নদীর পাড়ে। অনেকগুলো শাঁখও দেখতে পেলাম। আবদুল বলল 'যাবে নাকি পাড়ে?'

বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার বুক ঢিব ঢিব করছিল।

এবার হার স্বীকার করলাম। বললাম, 'না। বড্ড ভয় করছে—'

ছোট ডিঙিটা নিয়ে একলাই আবছুল পাড়ের দিকে চলে গেল। গেলেই দারুণ বিপদে পড়তাম। একটু পরেই তা বোঝা গেল। হঠাৎ দেখলাম সমুদ্রের দিকে জল যেন ফুঁলে উঠছে। আবছুল ডাঙায় ঝিনুক কুড়োচ্ছে। তাজ্জব কাণ্ড, দেখতে দেখতে সূর্যটা ফের জলের তলায় ডুবে গেল।

'আবছুল ডিঙিতে উঠে আয়।'—সমশের চিৎকার করে উঠল।

সমশেরের কথা শেষ হবার আগেই পাড়ে বৈঠায় বাঁধা দাঁড়টা ছিঁড়ে ডিঙি তীরবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটতে লাগল। নিতাই একটা বড় লগি এগিয়ে দিতে আবছুল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে ধরে ফেলল। ওর পেছনে জঙ্গল তখন ভীষণভাবে কাঁপছে। ভূমিকম্প হলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম।

তমিজদ্দি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'পালান, শীগগীর নোঙর তোল।'

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখি কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আর গাছের মাথা থেকে হাজার হাজার পাখি আর্ত চীৎকার করে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

কাঁড়াল থেকে বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল সমশের, 'হুঁশিয়ার, সব হুঁশিয়ার—

আচমকা তপনদা আমাকে ধাক্কা মেরে পাটাতনের ওপর ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট আকাশের কতগুলি ঢেউ পরপর আমাদের পিঠের ওপর দিয়ে চলে গেল। একবার চোখ খুলতে দেখি—বাঁদিকে কোথায় জঙ্গল। শুধু ঘোলা জল খলখল করছে। আর আমরা একটা মস্ত বড় ঢেউয়ের চূড়োয়। নৌকাটা যেন আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। এইভাবে কাটল কিছুক্ষণ। পাটাতনের কাঠ দুহাতে প্রাণপণে আঁকড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছি। এক সময় মনে হল—নৌকাটা যেন চরকির মত বনবন করে ঘুরছে। তারপর, আর কিছু মনে ছিল না।

হুঁশ ফিরে এসেছিল তমিজদ্দির কথায়। সে বলছিল, 'মাঝি, আজ তুমি শক্ত হাতে হাল না ধরলে আমরা সমুন্দুরের পানেই চলে যেতাম।'

উত্তরে সমশের বলেছিল, 'সবই আল্লার দোয়া বাটলে। উল্টা স্রোতে পড়লে কি আমবা এদিকে আসতে পারতাম।'

পেটে বেশ কিছুটা নোনা জল ঢুকে গিয়েছিল। সারা শরীর ভিজে সপসপ করছে। সকলেরই এক অবস্থা। হাড়িয়াভাঙা থেকে নৌকা একটা খালের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ আবার এক অঘটন। মনে হল, দূরে কোথাও 'গুম গুম' শব্দে কয়েক শ কামান একসঙ্গে গর্জে উঠল। সেই শব্দ শুনে তপনদা লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, 'বরিশাল গানস্, বরিশাল গান্স।'

অবিনাশকাকা বললেন, আরে, 'না না। লংকায রাবণ রাজার পুরীর সিংহ দরজা খোলা হচ্ছে, তাঁর শব্দ।'

সমশের মানতে চাইল না। বলল, 'ওটা গায়েবী আওয়াজ বাবু। ইমাম লোকলস্কর নিয়ে যুদ্ধ করতে আসতেছেন, তার শব্দ।'

অধৈর্য গলায় বলে উঠল তপনদা, 'সে যাই হোক, কিন্তু এ সময়ে কেন। শুনেছি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেই শুধু নাকি এই শব্দটা শোনা যায়।'

জবাব দিল তমির্জাদ্দ, 'ঠিক ধরেছেন বাবু। বর্ষাকালেই আওয়াজটা হয়। শীতে হঠাৎ করে ঝড় বাদল হয়েছে কিনা, তাই অসময়ে শুনতে পেলেন। নইলে পেতেন না।'

পরে তপনদা পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলেছিল। হাড়িয়াভাঙা নদীর একটু দূরে পুব-দক্ষিণ কোণায় রায় মল আর মালঞ্চ নদীর মোহনা। ওখান থেকে সমুদ্রের দিকে অল্প এগুলেই 'অতল স্পর্শ'। 'অতলস্পর্শ' একটা অদ্ভুত জিনিস। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম আর পুব দিক থেকে দুটো সামুদ্রিক স্রোত এসে ওখানটায় এক দারুণ ঘূর্ণির

সৃষ্টি করেছে। অতলস্পর্শ-এর চারদিকে সমুদ্রতল মাত্র পঞ্চাশ ষাট ফুট নিচুতে। কিন্তু, মাঝখানটা সতের আঠারো শ' ফুট গভীর। ওই ঘূর্ণির দারুণ টানে কাছাকাছি দ্বীপগুলির মাটি ক্ষয়ে যায়! এই ভাবে ক্ষয়ে যেতে যেতে একদিন হঠাৎ এক একটা দ্বীপই ভেঙে জলের তলায় চলে যায়। আর বরিশাল গানস হল, কারুর কারুর মতে সাগরের জলে মাটি ধ্বসে পড়ার আওয়াজ। কেউ বলে—সমুদ্রে ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের ধাক্কা লগার শব্দ। কেউ আবার বলে—ঝড়ো বাতাসের আওয়াজ। আওয়াজের কারণটা সাধারণ লোক মানে না। তাই তারা 'অতলস্পর্শ' নিয়ে নানারকম গল্প ফেঁদেছে।

সব শুনে বলেছিলাম, 'আমরা কিন্তু দারুণ বাঁচা বেঁচে গেছি, কি বলো তপনদা?'

তপনদা হেসেছিল, 'তুই শুধু বাঁচার কথাটাই ভাবছিস। বিপদে না পড়লে জীবনে আর কোনদিন কি ওই রকম দৃশ্য দেখতে পেতিস?'

শান্ত খাল। চওড়াও খুব বেশি নয়। এক সময় অবিনাশকাকা শুধোলেন, 'আমরা কোথায় এলাম তমিজ?'

তমিজদ্দি জবাবে বলল, 'মনে তো হচ্ছে এটা বাঘমাতা খাল।'

অবিনাশ কাকা কপালে চোখ তুললেন, 'বাঘমাতা, বলো কি! এধারে কি খুব বাঘটাঘ আছে?'

তমিজদ্দি হাসল, 'লোকে তো তাই বলে।'

সত্যি, সেই দিনই আমরা প্রথম রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেছিলাম।

সকালে জোর ধকল গেছে। বেলা বাড়তে সকলেরই খুব খিদে পেয়ে গেল। সঙ্গে করে চিড়ে মুড়ি যা আনা হয়েছিল এ' কদিনেই তা শেষ হয়ে গেছে। রান্নার আয়োজন করতে গিয়ে দেখা গেল নৌকায়

যা কাঠ ছিল সব ভিজে একসা। সমসের বলল, 'হেই নেতাই, হেই পালান—কুড়ুল বের কর। কাঠ আনতে হবে।'

পালান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওরে বাব্বা, যা 'গরম' জঙ্গল। ডাঙায় নামতে পারব না।'

নিতাইও ওর কথায় সুর মেলাল। গরম জঙ্গল মানে যে জঙ্গলে বাঘ থাকে।

হাল ছেড়ে সামশের উঠে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠল, 'পারবি না মানে। আমরা এতগুলো লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরব নাকি।'

কিছু দূরে খালের বাঁকের মুখে একটা চর। সেখানে কাশ, তুলো-টেপারি আর বনঝাউয়ের জঙ্গল। তমিজদ্দি বলল, 'জঙ্গলে ঢুকবার দরকার নেই। মনে হচ্ছে এই চড়াতে জোব মাটি পাওয়া যাবে।'

নৌকা এসে চরের কাছে নোঙর করল। পালান আর নিতাই কোদাল হাতে নেমে গেল। তিন চার ফুট খোঁড়ার পর কালো রংয়ের মাটি উঠতে লাগল। নিতাই বলল, 'আমাদের কপাল ভাল মাঝি। এখানকার জোব মাটি বেশ খটখটে।'

তমিজদ্দিকে তপনদা শুধোতে সে সব খুলে বলল। ঝড়ে বন্যায় পুরোন গাছপালা মাটিতে শুয়ে পড়ে। তারপর জোয়ারের জলে সেইসব গাছপালা পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। শেষে বহু বছর বাদে গাছপালা আর পলিমাটি মিশে পচে শুকিয়ে তৈরি হয় জোব মাটি। এই মাটিকেই বলা হয় পিঠ কয়লা। পিঠ কয়লাতে ভাল রান্না হয়।

এক সময় নিতাই চেঁচিয়ে উঠল চড়া থেকে, 'নিচে গ্যাঁড়ার হাড়। তুলব মাঝি?'

আমি সমশেরকে শুধোলাম, 'গ্যাঁড়া কি?'

সমশের জবাব দিল, 'গ্যাঁড়া হল গণ্ডার। এক সময় সোঁদরবনে গণ্ডার বাস করত, জানো না দাদাবাবু?'

তপনদা বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিয়ে এসো নিতাই। ওগুলো কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমি মিউজিয়ামে জমা দিয়ে দেব।'

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সবাই ছইয়ের বাইরে বসে আছি। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। সকালে জোর ভিজেছি। বেশ ভাল লাগছিল। নৌকা বাঘমতী খালের একধার ঘেঁষে এগুচ্ছে। তপনদার চোখে দুরবীন। এক সময় সে বলে উঠল, 'শিগগীর এদিকে আয় নিরু।'

আমি ছুটে গেলাম। তপনদার হাত থেকে দুরবীনটা নিয়ে চোখে লাগাতে থ' বনে গেলাম। দেখি—অনেক দুরে খালের ধার ঘেঁষে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কয়েক শ' হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। লম্বা সরু সরু পা। কান পর্যন্ত ছড়ানো চোখ। গায়ের রং বাঘের মতই হলদে। তবে সাদা ডোরা। কতগুলোর মাথায় বেশ বড় বড় শিং। কি সুন্দর দেখতে। মজার ব্যাপার, সেই হরিণের পালের মধ্যে কতগুলো ছোট লালচে রঙের কুকুরও দেখতে পেলাম। সে কথা বলতে তপনদা হাসল, 'ওগুলোও হরিণ, কুকুর নয়। ওকে বলে 'কুকুরে হরিণ।' এ জাতের হরিণ সুন্দরবন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।'

নৌকা নিঃশব্দে এগুতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে খালি চোখেই সব দেখতে পেলাম। ফাঁকা জমির পেছনে কেওড়া গাছের সার। জমির শেষে ওধারে একটা ছোট খাল ঢুকে গেছে। কেওড়া গাছের ডালে অসংখ্য বাঁদর। এ-ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যাচ্ছে। কোনটা আবার সার্কাসের জোকারের মত ডালে পা রেখে মাথা নিচে দিয়ে দোল খাচ্ছে। আনন্দে আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল। তপনদা ছোট্ট করে একটা চিমটি কেটে আমাকে চুপ করতে বলল।

হঠাৎ দেখি—জলের ধারে দুটো বাঁদর গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটু পরেই ওরা ডাঙায় উঠল। সারা শরীরে কাদা। ব্যাপার কি।

বাঁদরদুটো বনের দিকে ছুটে গেল। আবদুল ফিসফিস করে বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা মৌচাক ভাঙ্গতে যাচ্ছে দাদাবাবু'।

গায়ে কাদা মাখলে মৌমাছি হুঁল ফোটাতে পারে না। বাঁদরের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

নৌকা এগুচ্ছে। জায়গাটা আর বেশি দূরে নয়। হঠাৎ বাঁদরের দল ক্যা-ক্যা করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হরিণের পাল মুখ তুলে কান খাড়া করল। একটা বাঁদর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা হরিণের দু-গালে চট চট করে চড় মারতে শুরু করল। গলুইয়ের কাছ থেকে পালান চেঁচিয়ে উঠতে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। পালান বলে উঠল, 'মাঝি ভোঁতড় !'

'ভোঁতড়' মানে বাঘ। সুন্দরবনের মাঝি-বাউলেরা বাঘকে জঙ্গলে এসে কখনো বাঘ বলে ডাকে না।

ফিরে তাকাতে দেখি—পালান যেখানে দাঁড়িয়ে আর হাত দশেক দূরে জলের ধার ঘেঁষে হেঁতাল ঝোপের ভেতর থেকে [illegible] কম্বল গায়ে কি যেন একটা উঠে দাঁড়াল। এটাই রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কি বিশাল দেহ। পালানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হুংকার ছাড়তে বন কেঁপে উঠল। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। চোখ নয়—যেন দুটো আগুনের গোলা। পালান বৈঠা বাগিয়ে 'হেই হেই' করে চেঁচাতে লাগল।

বাঘের গর্জন শুনে হরিণের দল ছুটতে লাগল। জঙ্গলের ভেতর হুই-হুই রই রই কাণ্ড বেঁধে গেল। পালিয়ে যাওয়া হরিণের পায়ের খটাখট আওয়াজ, বাঘের হুংকার, বাঁদরদের চেঁচামেচি।

শিঙ্গেল হরিণগুলোর ছোটার ভঙ্গি মজাদার। গাছপালায় শিং আটকে যেতে পারে, এই ভয়ে মাথাটা পিঠের ওপর ফেলে দৌড়চ্ছে।

বাঘটার কি মতি হল—পালানের দিকে কিছুক্ষণ লোলুপ তাকিয়ে হরিণদের ধাওয়া করল। হরিণের পাল বনের দিকে না গিয়ে সামনের খালে একের পর এক প্রাণভয়ে ঝাপিয়ে পড়তে লাগল। একটা

পালান বৈঠা বাগিয়ে 'হেই-হেই' করে চেঁচাতে লাগল

হরিণ পেছনে পড়ে গেছে। আর একটা লাফ মারলেই বাঘটা সেটাকে ধরে ফেলবে।

এমন সময় বাঘের পেছনে ঝুপ করে একটা শব্দ। বাঘ ঘুরে দাঁড়াল। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছে একটা বাঁদর। হরিণটাকে বাঁচানোই ওর উদ্দেশ্য। বাঘ তেড়ে আসত বাঁদরটা বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে ফের এক লাফে গাছের ডাল ধরে ফেলল।

এর মধ্যে কখন যে তপনদা ছইয়ের ভেতর ঢুকে বন্দুক নিয়ে এসেছে জানি না। হঠাৎ তার হাতের বন্দুক গর্জে উঠল, 'গুড়ুম-গুড়ুম।'

—বন্দুকের গুলিতে সামনের হরিণটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। বেগতিক দেখে বাঘ বনের দিকে দৌড় মারল। তমিজদ্দি 'হায়, হায়' করে বলে উঠল, 'এাক করলেন বাবু? মায়াহরিণ মারলেন!'

মায়াহরিণ মানে মেয়ে হরিণ। বাউলেরা কখনো মেয়ে হরিণ মারে না। ওদের ধারণা—তাতে অমঙ্গল হয়।

ওদিকে ওধারের খালে হরিণের আর্ত চিৎকার। দুরবীনটা চোখে লাগালাম। দেখি—জল সাঁতরে হরিণের দল জঙ্গলের দিকে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু একটা হরিণ উঠতে পারেনি। তাকে ধরেছে কুমীরে। হরিণটার শরীরের অর্ধেকটা কুমীরের পেটে। আস্তে আস্তে কুমীর জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে। শেষবারের মত হরিণটা প্রাণপণ চিৎকার করছে, 'ট্রিউ-টিউ, ট্রিউ-ট্রিউ—'

এক বিপদ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আমরা আরেক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেটা তমিজদ্দি ছাড়া আমরা আর কেউ গোড়ার দিকে বুঝে উঠতে পারি নি। 'সাপের লেখা আর বাঘের দেখা'—কথাটা যে কতখানি সত্যি তা আমরা সেদিন রাত থেকেই টের পেতে শুরু করেছিলাম।

হরিণটাকে নিয়ে কুমীর জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাবার খানিক বাদেই ফের বাঘের প্রচণ্ড গর্জনে বনভূমি কেঁপে উঠল। সে কি ভয়ঙ্কর

ডাক। বুকের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বাঘের হুংকার থেমে যেতে তমিজদ্দির গলা শোনা গেল, 'ঝটপট বাঁয়ে ঢুকে পড়ো মাঝি—'

ঠিক তখনই আবদুল কনুই দিয়ে আমার পাঁজরায় আলতো করে একটা খোচা মেরে চাপা গলায় বলে উঠল, 'দেখেছ দাদাবাবু বড়মিঞা—'

'কই ?'—বলেই ঘাড় ফেরাতে দেখি বাঘটা আবার কখন জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে ফাঁকায় যেখানে মায়াহরিণটা মুখ থুবড়ে পড়ে পড়ে আছে—তার কাছে এসে দাড়িয়ে পেছনের দু'পা দিয়ে জোরে আঁচড়াচ্ছে। বিরাট হাঁ। মস্ত জিভ থেকে টসটস করে লালা ঝরছে। 'ঘর্‌র—ঘর্‌র'—মুখ থেকে একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। রাগে ওর মস্ত শরীরটা ফুলে দ্বিগুণ। ইয়া ইয়া বড় আগুনঝরা দৃষ্টি দিয়ে যেন আমাদের গিলে খেতে চাইছে। ভাবখানাঃ আস্পর্ধা তো কম নয়। আমার রাজত্বে তোমরা কার হুকুমে ঢুকেছ, অ্যাঁ।

ওদিকে সমশের বলে উঠল, 'বাঁয়ে কেন। সামনেই তো ভবকুণ্ডীর খাল।'

মাথা ঝাঁকাল তমিজদ্দি, 'না না, সোজা পথে যাওয়া চলবে না।

তপনদা সমশেরের পক্ষ নিল, 'মাঝি তো ভাল কথাই বলছে তমিজ। ঘুরতি পথে গিয়ে মিছেমিছি সময় নষ্ট করা—'

তমিজদ্দি কোন কথা শুনল না, 'আমাদের ওপর বড়মেঞার নজর পড়েছে। হুশিয়ার হয়ে চলতে হবে—'

অবিনাশ কাকা বললেন, 'নৌকোয় আমরা সাত-আটজন লোক। তাছাড়া সঙ্গে বন্দুক রয়েছে। এত ভয় কিসের ?'

তমিজদ্দি ক্ষেপে গেল, 'চুপ করে বসে থাকুন তো বাবু। জঙ্গলের বিপদের কথা আপনারা কতটুকু জানেন। আমি বাউলে। যা বলব তাই শুনতে হবে। নৌকা ঘোরাও মাঝি—'

পানসী বাঁদিকের সরু খালে ঢুকল। আঁকাবাঁকা পথে চলেছি আমরা। দেখতে দেখতে বিকেলের ছায়া নামল। দু'ধারে ঘন জঙ্গল। চারদিক ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। তমিজদ্দির মুখে একটাও কথা নেই। সে নৌকার একধারে দাঁড়িয়ে। ঝুঁকে পাড়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছিল।

সন্ধ্যা নামবার আগে আরেক অদ্ভুত কাণ্ড। হঠাৎই মনে হল—জলের ধার ঘেঁষে জঙ্গলের ভেতর কেউ যেন আমাদের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। প্রথমে মানুষের শিসের মত আওয়াজ। তারপর কড় কড় শব্দ। হাড় চিবোবার সময় যেমন আওয়াজ হয় তেমনি।

অবিনাশকাকা শুধোলেন, 'কিসের শব্দ তমিজ?'

'বড়মেঞার।' —চাপা গলায় উত্তর করল তমিজদ্দি।

'বলো কি!' —চোখ বড় করলেন অবিনাশ কাকা।

বিরক্ত হলেও তমিজদ্দি বলল, 'হ্যাঁ বাবু। বড়মেঞা মুখ দিয়ে আঠারো রকম শব্দ করতে পারে।'

তাহলে, তুমি বলতে চাও বাঘটা আমাদের পেছু নিয়েছে?' —প্রশ্নটা তপনদার।

'আলবৎ বাবু।' —জোর দিয়ে বলল তমিজদ্দি।

'কিন্তু—হাতের কাছে হরিণ থাকতেও আমাদের পেছনে ধাওয়া করবে কেন?' —অবিনাশ কাকা শুধোলেন।

'এই তো মজার কথা। বড়মেঞার স্বভাবের গতিক তো আপনার জানা নেই। একবার কোনো মানুষের ওপর নজর পড়লে সে তাকে সহজে ছাড়তে চায় না।'

'আমাদের কার ওপর ওর নজর পড়েছে বলে তোমার মনে হয় বাউলে?' —তপনদা জিজ্ঞেস করল।

'কার ওপর সেটা যে আন্দাজ করতে পারছি না এমন নয়। তবে সেকথা এখন বলা কি ঠিক হবে বাবু।' তমিজদ্দির জবাব।

'না—না, আমি ঠিক তা বলতে চাইছি না—,' তপনদা আমতা আমতা করল।

'কিন্তু বাঘ এভাবে আমাদের সঙ্গে কতদূর চলবে?' —শুধোলেন অবিনাশ কাকা।

'যতক্ষণ না সে তার শিকার ধরতে পারে। দরকার হলে পনের বিশ মাইল, এমন কি তারও বেশি।'—বলে খুক করে একটু কাশল তমিজদ্দি। তারপর ফের বলল, 'একে ঘোর পৌষ মাস। তার ওপর আজ আবার ভরা কোটাল। এ সময় বড়মেঞার তেজ দারুণ বেড়ে যায়। সেই জন্যেই তো আমরা ট্যারাবেঁকা পথে চলছি।'

একটু বাদেই পাশের জঙ্গলে 'ঘরর-ঘরব' শব্দ জেগে উঠতে বুঝলাম তমিজদ্দির অনুমান কতখানি সত্যি।

সমশের হাঁক পাড়ল, 'হেই লেতাই, হেই পালান! জোরে বৈঠা চালা। সামনে গাঙ—'

নৌকা খাল থেকে ছোট এক নদীতে পড়ল। পূর্ণিমার রাত। বনের মাথায় মস্ত গোল রূপোলি চাঁদ। নদী কানায় কানায় ভরে আছে। জ্যোৎস্নায় বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

রাত এক প্রহর কেটে যেতে তমিজদ্দি বলল, 'রান্নার বন্দোবস্ত করো মাঝি। আজ রাতে নৌকা নোঙর করা চলবে না। পালা করে জাগতে হবে আমাদের।'

তমিজদ্দি আর সমশের অবশ্য সারা রাতই জেগেছিল। অবিনাশ কাকার বয়স হয়েছে। তিনি রাতের প্রথম ভাগটা ছইয়ের বাইরে কাটালেন। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ রাত একটা থেকে আমি আর তপনদা জাগলাম। নৌকা স্রোতের দিকে চলছিল। বৈঠা বাইবার প্রয়োজন ছিল না। পালান গলুইয়ের কাছে গুটিসুটি মেরে পড়েছিল। উপর কোঠায় শুয়েছিল নিতাই আর আবদুল। সমশের হাল ধরে একঠায় বসে। মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্য হুঁকো টানছিল। নির্বিঘ্নে রাত কাটল। বিপদ এল ভোরের দিকে।

চাঁদের আলো নিভে যেতে নামল কুয়াশা। অমন কুয়াশা আমি জীবনে দেখিনি। দু হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। হঠাৎ কিছুর মধ্যে কিছু না—নৌকাটা ভীষণভাবে দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি হাতে তমিজদ্দি নৌকার সামনের দিকে ছুটে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'বড়মেঞা, বড়মেঞা—'

কুয়াশায় ঠিক মত কিছুই ঠাহর করতে না পেরে তপনদা আকাশের দিকে বন্দুক তুলে ট্রিগার টিপল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে একটা শব্দ। নৌকা আবার দুলে উঠল। বুঝলাম—বাঘ জলে লাফিয়ে পড়েছে।

আমরা সবাই এগিয়ে গিয়ে পালানকে ধরাধরি করে নিয়ে এসে পাটাতনে শুইয়ে দিলাম।

একটু বাদে আলো ফুটে উঠতে কুয়াশা কেটে গেল। দেখলাম—পালানের বুকে বাঘের লালা ছড়িয়ে আছে। ওর ভাগ্য ভাল। গলুইয়ের দিক থেকে বাঘ উঠেছিল। দু' হাতে ভর রেখে ওর মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। পালান একটা গামছা দিয়ে মাথা পেঁচিয়ে শুয়েছিল। টান দিতে গামছাটা খুলে যায়। তাই রক্ষা।

বাঘের লালা মারাত্মক বিষাক্ত। তমিজদ্দির কথামত জল গরম করে তাই দিয়ে লালা পরিষ্কার করা হল। পালানের গায়ে ততক্ষণে জ্বর এসে গেছে ও বিকট চিৎকার করে উঠল, তারপর 'আমারে ভোঁতড়ে ধরল, ভোঁতড়ে খেল' বলে প্রলাপ বকতে লাগল।

তমিজদ্দি বলল, 'একে 'কমকমা' রোগ বলে বাবু। বড়মেঞায় ধরলে মানুষে এমনি সুর করে চেঁচায় বাবু—'

হঠাৎ খেয়াল হল—বাঘটা প্রথমে পালানকে দেখেছিল। তাহলে কি ওর ওপরে নজর পড়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। কি ভয়ঙ্কর! ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

অঘটনটা ঘটল এর ঘণ্টা আড়াই বাদে। বেলা নটা নাগাদ।

পানসী তখন ছোট নদী ছেড়ে লোধিতুয়ানির খালে ঢুকেছে। বেশ চওড়া খাল। সমশের বলল, 'আরেকটা গোন (অনুকূল স্রোত) পেলেই আমরা গোসাবা নদীতে গিয়ে পড়ব বাবু।'

হাতমুখ ধুলাম। রাতভর জেগে তমিজদ্দি, সমশের দুজনেই ক্লান্ত। ওরা উপর কোঠায় গিয়ে গা এলিয়ে দিল। নিতাই গিয়ে হাল ধরল। গলুইয়ে লগি হাতে আবদুল। রোদ চড়া হয়ে উঠতে চোখে জ্বালা ধরল। আমি আর তপনদা ছইয়ের ভেতরে ঢুকে গেলাম। পালান তখনো পাটাতনে শুয়ে। অবিনাশকাকা বাইরে দাঁড়িয়ে। চুরুট ধরিয়ে সকালবেলার নদী দেখছে।

ভাটা পড়ে গেছে। নৌকা কিনারা ঘেঁষে চলছিল। পাড়ে কলাগাছের জঙ্গল। তাতে হলদে রঙের ফুল ফুটে আছে।

'ওরে বাবা, কি ভয়ানক কাণ্ড!' হঠাৎ অবিনাশকাকার গলা ফাটানো চিৎকারে ঝিমুনি কেটে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। বাইরের দিকে তাকাতে দেখি— আবার সেই বাঘ। একেবারে নৌকার ওপরে। মুখ নামিয়ে পাটাতনে শুয়ে থাকা পালানের গলা কামড়ে ধরে আছে। গলুইয়ের দিক থেকে 'হেই-হেই' শব্দে আবদুল বাঘের পিঠে এলোপাথাড়ি লগির বাড়ি মেরে যাচ্ছে। জানোয়ারটার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে ধীরে সুস্থে পালানকে আধখানা টেনে তুলল। জলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর দু'পা ভেঙে মারল এক লাফ। ঝুপ করে গিয়ে পড়ল কলাগাছের ঝোপের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা ভীষণ ভাবে দুলে উঠল। আমি টাল সামলাতে পারলাম না। তপনদার সঙ্গে জোর মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। চোখে সরষে ফুল দেখলাম।

কাড়ালের দিক থেকে তমিজদ্দি নিতাই সমশের ছুটে এল। ছইয়ের ভেতর থেকে অবিনাশকাকার কোমর অব্দি দেখা যাচ্ছে। তিনি বলির পাঁঠার মত থর থর করে কাঁপছিলেন। বলে উঠলেন ভাঙা ভাঙা গলায়, 'তপন, নিরু—শিগগীর ভেতর থেকে বন্দুক নিয়ে এসো।'

কলাগাছের ঝোপ তোলপাড় করে বাঘ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার হলদে ডোরা দেখা যাচ্ছে'। তমিজদ্দি চেঁচিয়ে বলল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম—বড়মেঞার নজর এড়ানো সহজ কর্ম নয়।'

কিছুক্ষণ বাদে বেশ অনেকটা দূরে ফাঁকায় বাঘটাকে ফের দেখা গেল। আমাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে জানোয়ারটা পাড়ের নরম মাটিতে পালানকে বসিয়ে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাল। দাঁত কড়মড় করে ছাড়ল এক বিকট হুংকার।

কাদামাটিতে কোমর পর্যন্ত গেঁথে গেছে পালানের। দেখলে মনে হয়—ও যেন পদ্মাসনে বসে আছে। উফ্ কি ভয়ানক দৃশ্য! গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। বুক ভিজে যাচ্ছে সেই রক্তে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুহাত তুলে মুখ হাঁ করে পালান যেন আমাদের কিছু বলতে চাইছে।

আমরা ছইয়ের বাইরে আসতে নিতাই তপনদার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'বাবুমশাইরা আপনারা পালানকে বাঁচান—

তপনদা বন্দুক তুলল। তমিজদ্দি বলল, 'মিছেমিছি চেষ্টা করছেন। বাঘ গুলির সীমানার বাইরে—

তপনদা রীতিমত উত্তেজিত। বলল, 'তাহলে চলো বাউলে, ডাঙায় নামি—

তমিজদ্দি মাথা নাড়ল, 'উহুঁ, গোয়ার্তুমি করে লাভ কিছুই হবে না। এখন ডাঙায় উঠলে বিপদে পড়ে যাব। বড়মেঞা ভীষণ হুঁশিয়ার—

বাঘ কি মানুষের ভাষা বোঝে। তমিজদ্দির কথা শেষ হতেই সে এক থাপ্পড়ে পালানের গলা থেকে একদলা মাংস তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সব ছটফটানি শেষ। পালানের শরীরটা ধুপ করে উবু হয়ে পড়ে

গেল কাদায়। নিতাই 'হায়-হায়' করে উঠল। বাঘটা এবার মা-বেড়াল যেমন বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে তেমনি করে পালানকে ধরে হেলতে দুলতে বিজয়ীর মত ওপরের দিকে উঠে বনের গাছপালার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তপনদা ক্ষেপে গেল, 'তোমার কোন কথা শুনব না বাউলে। বাঘটাকে যেভাবেই হোক খতম করতে হবে।'

তমিজদ্দি গোমড়া মুখে বলল, 'সে আপনি যা-ই বলুন বাবু, গরম ভাত না খেয়ে আমি জঙ্গলে ঢুকতে পারব না।'

অবিনাশকাকা তপনদাকে শান্ত করলেন, 'খামাখা মাথা গরম করছ কেন তপন। তমিজদ্দি বাউলে। বাউলেদের গরম ভাত না খেয়ে জঙ্গলে ঢোকা যে বারণ—

চটপট উনুন ধরিয়ে চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়া হল। খাওয়ার শেষে সমশের বলল, 'পালান বেঁচে নেই। খামাখা বনে ঢুকে কি হবে। তার চেয়ে—যখন জোয়ার এসে গেছে তখন নোঙর তুলে ফেলি, কি বলেন বাবু?'

তপনদাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তমিজদ্দি কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সমশের, তুমি না সোঁদর বনের মাঝি। লাশ ফেলে খালি হাতে ফিরলে গাঁয়ের লোক তোমাকে কি বলবে—জানোনা?'

হক কথা। এটাও বনের নিয়ম। সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে বাঘে ধরে নিয়ে গেলে খালি হাতে ফেরা বারণ। তাতে গ্রামের লোক সন্দেহ করে। ভাবে—হয়ত দলের অন্যান্যরা শত্রুতা করে মানুষটাকে মেরে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছে। তাই মৃতদেহের গা থেকে রক্ত-মাখা জামাকাপড় যাহোক একটা কিছু চিহ্নস্বরূপ নিয়ে আসতে হয়।

অবিনাশকাকা এবারেও বাধ সাধল। কিছুতেই আমাকে জঙ্গলে যেতে দেবে না। তমিজদ্দি বলে কয়ে রাজী করাল। বলল, 'এতই

যখন ইচ্ছে চলুক না দাদাবাবু। ভয় পাচ্ছেন কেন কত্তা, আমি তো সঙ্গে রয়েছি।'

ডিঙিতে চেপে আমরা কলাগাছের ঝোপ ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গার কাছে চলে এলাম। পালান যেখানে পড়েছিল সেখানে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে। সামনে তমিজদ্দি, মাঝখানে আমি। সবার শেষে তপনদা। ওদের দুজনের হাতেই বন্দুক।

তমিজদ্দি খোঁচ ধরে এগুচ্ছে। 'খোঁচ' মানে বাঘের পায়ের ছাপ। ওপরে উঠতেই বাধা। গাছের শিকড়ে সামনের পথ দুর্গম। দুই-আড়াই হাত উঁচু শিকড়। এগুলিকে বলে শুলো। চ্যাপটা, আগার দিকটা বর্শার মত ছুঁচলো। যেন ভীষ্মের শরশয্যা।

খোঁচ ধরে আমরা ডানদিকে এগিয়ে গেলাম। বন দেখতে কি সুন্দর। কে বলবে এরই ভেতর মৃত্যু লুকিয়ে আছে। বড় বড় গাছের কাণ্ড। সুন্দরবন নাম হলেও এদিকে সুন্দরী গাছ নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ কেওড়া গাছ। তাদের কাণ্ডগুলো মোটা মোটা, নিশ্চল প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। নিচের দিকটা ফাঁকা, পরিষ্কার। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

খোঁচ ধরে অনেকক্ষণ হাঁটার পর একটা হদো গাছের ঝোপের কাছে এসে পালানের লাশটা খুঁজে পেলাম। বুকের অনেকটা মাংস খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছে। তমিজদ্দি চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিল। তারপর লাশের সামনে এগিয়ে গিয়ে রক্তমাখা ছেঁড়া-খোঁড়া ফতুয়াটা আস্তে করে খুলে ফেলতে ফেলতে বলল, 'বুঝলেন বাবুমশাইরা, যদ্দুর মনে হচ্ছে—বড়মেঞা কাছেপিঠে নেই—

আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাঘ শিকার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই এবার ফেরার পালা। ফিরতি পথে খানিকটা এগুবার

পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল তমিজদ্দি। কি ব্যাপার! ফিস-ফিস করে সে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু। আমরা বোধহয় পথ ভুল করেছি!

'সে কি কথা!'—তপনদা চোখ বড় করল।

সুন্দরবনের জঙ্গলে এই এক বিপদ। চারিদিকের গাছপালা, দৃশ্য একই রকম দেখতে। ফলে পথ ভুল হবার সম্ভাবনাটা খুবই বেশি। দমচাপা গলায় বলল তপনদা, 'তাহলে তো এখন গাছে উঠে পথের নিশানা খুঁজে বের করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।'

তমিজদ্দি কি ভেবে বলল, 'ঠিক আছে। খোঁচ ধরে এগোই তো। ফেরার রাস্তা খুঁজে না পেলে শেষে না-হয় গাছেই চড়ব।'

আমরা এগিয়ে চললাম রুদ্ধ-নিশ্বাসে। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমন কি ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকও শোনা যাচ্ছে না। শুনেছি যে বনে বাঘ থাকে সেই বন নাকি এরকম থমথমে, নিস্তব্ধ হয়।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের মত সময় এভাবে হাঁটার পর তমিজদ্দি বলল, 'হ্যাঁ যা ভেবেছিলাম—ঠিক তাই বাবু। আমরা বড়মেঞার চক্করের মধ্যে পড়ে গেছি।'

শুনে মুহূর্তে বুকের রক্ত যেন জমাট বেধে গেল। শুনেছি—জঙ্গলের ভেতর বাঘের যাতায়াতের নাকি নিজস্ব পথ থাকে। বাঘ যদি বুঝে ফেলে মানুষ তার পথ ধরেছে তাহলে সে আর নিজের পথে এগোয় না। সে তখন গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। এই গোল পথকে বলে চক্র। গোলোকধাঁধার মত যখন মানুষ ঐ চক্রের মধ্যে লাট খেতে থাকে তখন চতুর বাঘ অতর্কিতে পেছন থেকে এসে তাকে আক্রমণ করে।

'তাহলে এখন উপায় বাউলে?' তপনদার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

'উপায় আর কি, শিগ্‌গীর চক্করের বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে।' —জবাব দিল তমিজদ্দি।

'কিন্তু তাতে তো আমরা একেবারে উল্টো পথে চলে যেতে পারি।'

'উল্টো সোজা পরে ভাববেন বাবু। এখন আমার পেছনে পেছনে আসুন তো। আগে প্রাণটা বাঁচান—

চক্রপথ পার হয়ে আমরা নিঃশব্দে যতটা জোরে হাঁটা যায় হাঁটতে লাগলাম। এবং শেষমেষ পৌঁছলাম এক ফাঁকা জায়গায়, খালের কাছে! তপনদার দিকে তাকিয়ে ফের তমিজদ্দি বলল, 'আপনারা চটপট ওই কেওড়া গাছটায় উঠে পড়ুন বাবু। বড়মেঞা নির্ঘাৎ আমাদের পেছু নিয়েছে। খানিকবাদে এদিকেই আসবে।'

আমি আর তপনদা ছুটে কেওড়া গাছটার কাছে গেলাম। গাছের পেছন দিককার খালে চর মত একটা জায়গায় কতগুলো কুমীর রোদ পোহাচ্ছিল। বেশ বড় গাছ। ওপরে উঠতে হাত পায়ের অনেকটা ছড়ে গেল। বেশ উঁচুতে উঠে একটা মোটা ডালে গিয়ে আমরা বসলাম। তমিজদ্দি নিচে, ফাঁকা মাঠমত জমিতে দাঁড়িয়ে। কোত্থেকে তিনটে শুকনো ডাল জোগাড় করে বুনো লতা দিয়ে সেগুলো বেঁধে তেকাঠির মত একটা জিনিস তৈরি করে ফেলেছে। সেটাকে এক জায়গায় রেখে বন্দুকটা তার ওপর হেলান দিয়ে রেখে পকেট থেকে কালো সুতোর গুলি বের করল। তারপর ট্রিগারের সঙ্গে সেই সুতোর একদিক বেঁধে দিয়ে আরেকদিক ছাড়তে ছাড়তে বাঘ যে পথ দিয়ে আসতে পারে, সেই পথ জুড়ে দূরের একটা গামুর গাছের সঙ্গে টানা দিয়ে বেঁধে দিল।

একে বলে "কলাপাতা" শিকার। এগুবার সময় সুতোয় বাঘের পা লেগে গেলে ট্রিগারে টান পড়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে এসে ধাঁ করে তার বুকে বিঁধে যাবে।

শিকারের কল পেতে তমিজদ্দি উঠে এল গাছে। এসে বসল আমাদের নিচের ডালটায়। তারপর খাটো গলায় বলল, 'বন্দুকটা

আমাকে দিন বাবু।' তপনদা তার বন্দুকটা নামিয়ে দিল। আমরা বাঘের অপেক্ষায় বসে রইলাম।

পথ হারিয়ে বাঘের ভয়ে গাছে ওঠার মস্ত একটা লাভ হয়েছিল আমাদের। বাঁদিকে খানিক দূরে হেঁতালের ঝোপ। তার পরেই গাঙ। উঁচু ডালে বসায় গাঙে নোঙর করা আমাদের পানসীটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

বিপদ শুধু সামনের দিকে নয়, পেছনেও। ঘাড় ফেরাতে তা মালুম হল। আমাদের গাছটার গা ঘেঁযেই খাল। সেই খালের চড়ায় কুমীরের জটলা। মানুষের সাড়া পেয়ে পেল্লাই সাইজের দুটো কুমীর জলে নেমে নিঃশব্দে ডাঙার দিকে এগিয়ে এল। তারপর হামা দিয়ে পাড়ের ঢালুতে বুকসমান উঠে এসে আমাদের দিকে পিটপিট করে তাকাতে লাগল। ওদের চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল—বহুকাল বাদে ওরা যেন সুখাদ্যের সন্ধান পেয়েছে।

দমবন্ধ করে বসে আছি। বুকে ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। চারদিক শান্ত। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। শীতের ঘন সোনালি রোদে সামনের ফাঁকা মাঠমত জায়গাটুকু ঝলমল করছে।

তমিজ বাউলের আশঙ্কা মিথ্যে নয়। একসময় তা টের পেলাম। তপনদা ইশারায় আমাকে সামনের দিকে তাকাতে বলল। দেখি—দূরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমাদের সেই পরিচিত বাঘটি। বিরাট দেহ। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। ভয়ঙ্কর, তবু কি সুন্দর দেখতে। চোখ ধাঁধানো হলদে রঙের ওপর যেন কেউ গাঢ় করে কালো কালির পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছে। মাথা নীচু করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগুচ্ছিল। বুঝতে বাকি রইল না—জানোয়ারটা আমাদেরই খুঁজছে।

কালো সুতোর কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো বাঘ। ভাল

করে সুতোটাকে দেখল। তারপর মুখ তুলল। চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে জঙ্গলের দিকে লাগাল ছুট। তমিজদ্দি নিচের ডাল থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল, গতিক ভাল বুঝছি না বাবু। মনে হচ্ছে, বড়মেঞা দারুণ সেয়ানা—

সত্যি তাই। একটুবাদেই বাঘটা ফিরে এল। মুখে একটা গরাণের ডাল। গুটি গুটি এগিয়ে টানা দেওয়া কালো সুতোর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর অবাক কাণ্ড। বাঘটার কি বুদ্ধি। ডালটা দিয়ে সুতোয় মারল টান। সঙ্গে সঙ্গে তেকাঠি নড়ে উঠতেই ট্রিগারে খচ্ করে একটা শব্দ। পলক ফেলার আগেই লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির গুড়ুম আওয়াজ শুনতে পেলাম। মানুষের ফন্দি ধরতে পেরে বাঘ হুংকার ছাড়ল। কি গম্ভীর সেই আওয়াজ। ভয়ে আমি চিৎকার করে দুহাত দিয়ে তপনদার কোমর জাপটে ধরলাম। আমার গলার আওয়াজ পেয়ে বাঘটা ছুটে এল কেওড়াগাছের দিকে। তমিজদ্দি বলে উঠল সাবধান, বাবুমশাইরা—

গাছতলায় এসে বাঘ মুখ তুলল। ভাল করে দেখে নিল আমাদের। কি বিশাল মুখ, মস্ত একটা ধামার মত। ইয়া বড় বড় দুটো চোখ। যেন দৃষ্টি দিয়েই আমাদের গিলে খাবে। লেজ ঝাপটাল। শরীর কোলাল। গহ্বরের মত বিরাট হাঁ বের করল। লালচে রঙের বিরাট জিভ থেকে টসটস করে লালা ঝরছে। তারপর শুরু হয়ে গেল মুখ ভেংচানি, দাঁত কড়মড় করা আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ। ওর গরম নিশ্বাসের ঝাপটা এসে লাগছিল আমাদের চোখেমুখে। তমিজ বাউলের প্রাণে ভয়ডর নেই। বাঘ গর্জায়। সেও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে। বাঘ মুখ ভেংচায় তো বাউলও ভেংচে ওঠে। বিড়বিড় করে কি সব যেন বলে। দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগালি দেয়। এটা হল জঙ্গলের দস্তুর। বাঘের সামনে পড়লে নাকি ভয় পেতে নেই। উল্টো হম্বি-তম্বি করতে হয়। না হলেই বিপদ। একবার যদি বাঘ বুঝে ফেলে

মানুষ ভয় পেয়ে গেছে তাহলে আর রক্ষে নেই। যে করেই হোক সে তাকে খতম করবে।

এরপর নতুন ভেলকি দেখাল বাঘ। তড়পানি শেষ করে লাফ দিতে আরম্ভ করল। অত বড় শরীর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এক লাফে জনোয়ারটা দশ-বার ফুট উচুঁতে উঠে আসছিল। আর একটু হলেই তমিজদ্দিকে ধরে ফেলে আর কি। বাঘের দাপাদাপিতে মাটি কাঁপছিল। আর সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল কেউ যেন গাছটাকে ঝাঁকাচ্ছে বারে-বারে।

এইভাবে অনেকক্ষণ লাফ-ঝাঁপ দিয়ে এক সময় বাঘ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবে সঙ্গ ছাড়ল না আমাদের। দাঁড়িয়ে রইল গাছের তলায়।

এদিকে আমাদের নামার অপেক্ষায়। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসছে। আমার গায়ে তখন ভালুকে জ্বর। তপনদাকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে আছি। আর কাঁপছি ঠক ঠক করে। তমিজদ্দি বগলে বন্দুক চেপে ধরে হাতবাড়িয়ে একটা একটা করে শুকনো ডাল ভাঙছিল। একসময় তপনদা চেরা চেরা গলায় বলে উঠল, এখন উপায় বাউলে! একটু পরেই যে চারদিক আঁধার হয়ে আসবে। সারারাত আমরা এখানে থাকব নাকি? একটা লতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে চাপা গলায় ধমকে উঠল তমিজদ্দি, চুপ-চাপ বসে থাকুন তো। দেখুন না কি করছি—

হাজার হলেও বুদ্ধিতে বাঘে মানুষের সঙ্গে এঁটে উঠবে কেন। লতা দিয়ে ডালগুলোকে বেঁধে মস্ত একটা আঁটি তৈরী করল তমিজদ্দি। তারপর আচমকা বাবা গো, মলুম গো,—বলে বিকট সুর করে চেঁচিয়ে উঠে আঁটিটা খালের দিকে ছুড়ে দিল। ধপ করে একটা ভারী শব্দ হতেই বাঘ তড়াক করে জলের দিকে মারল এক লাফ। কুমির দুটো হাঁ করেই ছিল।

একটা সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরল বাঘের পা।

তীক্ষ্ণ গলায় তমিজদ্দি বলে উঠল, ঝটপট নেমে পড়ুন বাবুমশাইরা—

প্রাণের দায়ে গাছে অত উঁচু থেকে হুড়মুড়িয়ে আমরা যে কিভাবে অক্ষত অবস্থায় মাটিতে নেমে এলাম তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তপনদা ছুটে গিয়ে তেকাঠির পাশে পড়ে থাকা বন্দুকটা তুলে নিল। তারপর দুজনে তমিজদ্দিকে অনুসরণ করলাম। ওদিকে তখন চলছে বাঘে-কুমীরে জোর লড়াই।

দৌড় দৌড়। হেঁতালের ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটবার সময় হাত-পায়ের কত জায়গায় যে ছড়ে গেল। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের। শেষে গাঙের পাড়ে পৌছুতে পানসী থেকে অবিনাশ কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই যে ওরা আসছে—

ডিঙি নিয়ে আবদুল এগিয়ে এল। তমিজদ্দি কোমর থেকে গামছা খুলে সেটাকে একটা তবলা গাছের ডালে বেঁধে দিল। এটাও জঙ্গলের রীতি। কোনো জঙ্গলে বাঘে মানুষ ধরে নিয়ে গেলে এমনি করে কাপড় জাতীয় একটা কিছু গাছ কিংবা বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে দিয়ে আসতে হয়। যাতে পরে যা আসে, সে কাঠুরে কিংবা বাউলে যেই হোক তারা সাবধান হতে পারে।

পানসীতে উঠেই প্রশ্ন করেছিল তপনদা, বাঘটা যখন লাফ মারছিল তখন হাতের কাছে পেয়েও ওকে তুমি গুলি করলে না কেন বাউলে?'

তমিজদ্দি বলেছিল, 'এটাও বুঝলেন না বাবু। ওই বড়মেঞা নিশ্চয়ই বনবিবির চেলা। নইলে অত বুদ্ধি ধরে। গুলি করলে ওর গায়েই লাগত না।' এ এক অদ্ভুত ধারণা বাউলেদের। যে সব বাঘ খুব ধূর্ত হয়—ওরা ভাবে, তারা বুঝি বনদেবীর ভক্ত। যেই কারণে এসব বাঘকে ওরা কিছুতেই আঘাত করতে চায় না।

পর পর দুদিন শরীরের ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে। খাওয়া-

দাওয়ার পর গা এলিয়ে দিতেই চোখে নামল ঘুমের ঢল। একঘুমে শীতের বড় রাত ভোর করে দিলাম।

'বঙ্গদুনী আর কতদূর মাঝি?' —অবিনাশ কাকার গলার আওয়াজে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বললাম। সমশের উত্তর করল, আমাদের কপাল ভাল কত্তা। ওই তো, ভাঙ্গদুনী দেখা যাচ্ছে—

বাইরে এলাম। বনের ফাঁক দিয়ে সূর্যটা উঁকি মারছে। আবার বিরাট নর্দা। স্রোতের প্রবল টানে দেড়দিনের পথ এক রাত্তিরেই পার হয়ে আমরা লোথিয়ানির খাল ছাড়িয়ে ফের গোসাবা নদীতে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে সোজা দক্ষিণে কিছুটা এগুলেই মোহনা। নৌকা সেদিকে গেল না। নলছ্যাও দিয়ে ডাইনে ঢুকে পড়ল।

ভোরের শান্ত নদী। সকালের আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে। তপনদার মুখে আর হাসি ধরে না। ছইয়ের বাইরে আসতে আমাকে বলল, আমরা ফিরিঙ্গির রাজধানীর কাছাকাছি এসে গেছিরে নিরু—

বহুদিনবাদে ছোটকার কথা মনে পড়ে গেল। এ'কদিন যা ঝড় বয়ে গেছে আমাদের ওপর দিয়ে। এই ভয়ঙ্কর জল-জঙ্গলের রাজ্যে ছোটকা কি এতদিন বেঁচে আছে! কথাটা ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল।

তমিজদ্দি বলল, 'আপনার দূরকলটা একটু দেবেন বাবু?'—তপনদা দূরবীনটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

সেই পুরোন দৃশ্য। দুধারে ঘন জঙ্গল। নদীর ধার ঘেঁষে শুলোর জটলা। গাছের ডালে পাখিদের ভিড়। অভিশপ্ত সুন্দরবন কবে থেকে আমাদের পেছু নিয়েছে। জল ছিটোতে চোখে জ্বালা ধরল। হেঁতাল বন দিয়ে ছুটবার সময় সারা শরীর ছড়ে গিয়েছিল। তার ওপর নোনা হাওয়ায় এখানে সেখানে চামড়ার ওপর ফোস্কা পড়ে গেছে।

নৌকা বঙ্গদুনীকে বাঁয়ে রেখে দক্ষিণমুখো এগুতে লাগল। ডাইনে ডালহৌসী। দুধারের এই দ্বীপদুটোই বেশ বড়।

কিছুটা পথ এগুতে এক দঙ্গল মেছো নৌকা চোখে পড়ল। তমিজদ্দি দেশোয়ালি ঢঙে সুর করে হাঁক পাড়ল, 'সাঁইদার কে আছো গো?'

মেছো নৌকার দলের সর্দারকে বলে সাঁইদার। বছরে দুবার সুন্দরবনে মাছ ধরার মরশুম লাগে। এখন একবার। কার্তিক থেকে ফাল্গুন মাস অব্দি। এ সময়ে জেলেরা নদী-খাড়িতে 'কোমর জাল' ফেলে। আরেকবার ওরা আসে বর্ষার সময়ে। জ্যৈষ্ঠের শেষে। এখন থেকে ভাদ্র অব্দি ওরা 'বেনজাল' ফেলে মাছ ধবে। 'কোমর-জাল' ফেলে মাছ ধরে কোটালের শেষে ওরা ফিরছিল। কোটাল বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় যে জলোচ্ছ্বাস হয় তাকে। কিন্তু জেলেদের কাছে কোটাল মানে এক অমাবস্যা থেকে আরেক পূর্ণিমা—এই পনের দিন সময়। এই পনের দিন ধরে ওরা দল বেঁধে মাছ ধরে। তারপর ফিরে আসে। আবার নতুন কোটাল দেখে ওরা বের হয়। সামনের নৌকা থেকে একজন উঠে দাড়িয়ে জবাব দিল 'এই যে আমি—

সমুদ্দুর এখান থেকে কদ্দুর?'

'এই ভাটিতেই পৌছে যাবে। কিন্তু তোমরা কারা?

আমারা মনে, এই একটু বেড়াতে এসেছি।'

'বেড়াতে! এই ঘোর জঙ্গলে। বলো কি!—সাঁইদারের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ঝরে পড়ল।

'একথা কেন বলছ রাজবংশীর পো। জঙ্গলে কি কেউ বেড়াতে আসে না?—তমিজদ্দি শুধোল।

সাঁইদার যেন একটু দমে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার তো মনে হয় তোমাদের আর এগুনো ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'কিছুক্ষণ আগেই বাচ্চু ডাকাতকে দেখলাম কি না।'

'সে কি, বাচ্চু ডাকাত!'—আঁৎকে উঠল সমশের।

বাচ্চু ডাকাতকে সুন্দরবনের দক্ষিণদিকের সব মানুষই ভয় পায়। এমন কি পুলিশের লোকেরাও ওকে ঘাঁটাতে চায় না। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করে বেড়ায়। বাচ্চু ডাকাত ভয়ানক নিষ্ঠুর। গরিব কাঠুরে, মৌলেদের পর্যন্ত রেহাই দেয় না। চাল ডাল—খোরাকি সঙ্গে যা নিয়ে আসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। বুড়ো বাচ্চা কাউকে ছেড়ে কথা কয় না।

থাকুক ডাকাত। এতদূর এসে শেষে ডাকাতের ভয়ে ফিরে যাব নাকি। তা হবে না।' —তপনদা বলল জোরের সঙ্গে।

বেলা এগারোটা নাগাদ বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি এসে পৌঁছুলাম অদূরে নদী সমুদ্র। গুরু গুরু ঢেউয়ের গর্জন শোনা যাচ্ছিল নৌকা ডানদিকের পাড় ধরে এগুচ্ছে। হঠাৎ দূরবীন থেকে চোখ নামিয়ে বলে উঠল তামজাদ্দ, ওই তো, ওদিকের বনেই ফিরিঙ্গিদের আস্তানা।

'এত দারুণ জঙ্গলের মধ্যে আস্তানাটা তুমি কি করে চিনলে তমিজ?' —অবিনাশদার প্রশ্ন।

ততক্ষণে তপনদা তামজাদ্দর হাত থেকে দূরবীনটা কেড়ে নিয়েছে। চোখে লাগিয়েই সে বলল, 'হ্যা হ্যা, ওই তো গাছের ফাঁক দিয়ে দুর্গের বুরুজ দেখা যাচ্ছে।'

পানসী এবার ডান দিকের একটা খালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। খালটা খুব চওড়া নয়। পাশাপাশি দু'তিনটের বেশি নৌকা চলাচল করতে পারবে না। এদিকে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। এক সময় এই সব দুর্গম আর নির্জন দ্বীপেই হার্মাদরা আস্তানা গাড়ত। ভাবতে উত্তেজনায় বুক কেঁপে উঠল। তিনশ বছর আগেকার এক ছবি যেন চোখের সামনে ফুটে উঠল। সে সময় এইসব নদী খালে ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটেদের আনাগোনা। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর জলদস্যু ছিল তারা। আচমকা এসব জায়গা থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে লোকালয়ে ঢুকে লুঠতরাজ করত। গ্রামের পর

গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে দিত। ফিরে আসার সময় জোর করে সুস্থ, সবল মানুষদের ধরে নিয়ে আসত। হাতের তালু ফুটো করে তার ভেতর সরু বেত ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দলে দলে নৌকা আর জাহাজে তুলে পাটাতনের নিচে ফেলে দিত। তারপর পাখিদের যেমন খাবার ছড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনি কিছু চাল তাদের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হত। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অনেকেই খোলের মধ্যে মারা যেত; যারা বাঁচত, সেই সব হতভাগ্যদের তমলুক আর বালেশ্বরের হাটে বিক্রি করে দেওয়া হত। কখনো আবার তাদের নিয়ে যাওয়া হত আরো অনেক দূরে; সুদূর দক্ষিণ ভারতে। সেখানে ওলন্দাজ, ইংরাজ আর ফরাসী বণিকেরা তাদের কিনে নিত।

'ভেতরে কে আছো, শিগগীর বেরিয়ে এসো।' —বন্দুক বাগিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় তপনদা চেঁচিয়ে উঠতে আমার চমক ভাঙল। তাকিয়ে দেখি খালের পাড় ঘেঁষে কাশাঝোপের ভেতর একটা নৌকা।

তপনদার কথা শেষ হতে না হতেই সেই নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে গলুইয়ের দিকে ছুটে একটা লোক এল। চেনা চেনা মনে হল মানুষটাকে। হ্যাঁ, সেইতো টকটকে গায়ের রং, লম্বাটে মুখ—যে লোকটা আমাদের দত্তর গাঙ থেকে খালে ঢুকতে বলেই পালিয়ে গিয়েছিল। লোকটা হাত জোড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'দোহাই গুলি করবেন না, আমার কথা শুনুন—'

তপনদা কিন্তু বন্দুক নামাল না। বলল ব্যঙ্গের সুরে, 'দাড়ি কামিয়ে ফেলে আমার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয় জন। সেদিনই আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম।'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জন পেরেরা। মানে, বিষ্টুচরণের গোরাবাবু। ডুমুরখালি বঙ্গসুন্দরী স্কুলের শিক্ষক—ছোটকার সহকর্মী। সে এই ঘোর জঙ্গলে এসেছে কেন?

নৌকাটা কাছে এগিয়ে এল। জনের কাছ থেকে অনেক কথা জানতে পারলাম। খুলে না বললেও কথাবার্তার আভাসে জন বুঝতে

পেরেছিল—ছোটকা হার্মাদদের এক আস্তানার খোঁজ পেয়েছে। ছোটকা হঠাৎ নিখোঁজ হল। আমরা ডুমুরখালিতে পৌঁছুলাম। এক রাত্তির থেকে আমরাও সেখান থেকে চলে এলাম। তমিজদ্দিকে না পেয়ে পঞ্চানন কলিমদ্দিকে জোরজবরদস্তি করে নৌকায় তুলল। সব ব্যাপারটাই জনের কাছে সন্দেহজনক ঠেকছিল। সেও তখন সাত তাড়াতাড়ি পঞ্চাননের পেছু নিল। এবার আর বুঝতে কষ্ট হল না—যারা রাতে আমাদের পানসী আক্রমণ করেছিল তারা পঞ্চাননের দল।

সব শুনে তমিজদ্দি বলে উঠল, 'সেকি, শকুনটা আমার বুড়ো বাপকে ধরে নিয়ে এসেছে !'

'পঞ্চাননেব দল এখন কোথায় ?'—তপনদা শুধোল।

'ভোর ভোর এই জঙ্গলেই ঢুকেছে।' জন উত্তর করল।

'কিন্তু পঞ্চানন এই আস্তানার কথা জানল কোত্থেকে ?'

'আমি বাপজানকে বলেছিলাম। সে-ই হয়ত—' তমিজদ্দির কথা শেষ হবার আগেই তপনদা ফের প্রশ্ন করল জনকে, 'তা আপনিই বা পঞ্চাননের পেছু নিলেন কেন ?'

'আমি পর্তুগীজ। বিশ্বাস করুন—জাতির লুপ্ত গৌরবের সন্ধানেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। শুভবাবুব কোন ক্ষতি হোক—এটা আমি চাই না।'

'তা না হয় হলো। কিন্তু হঠাৎ পঞ্চাননকে অনুসরণ না করে মাঝপথে এখানে এসে থেমে গেলেন কেন ?'

'আমি ওর পেছন পেছনই আসছিলাম। হঠাৎ ফিরে তাকাতে দেখি খালের মুখে তিনটে ছিপ নৌকা। তাই বাধ্য হয়ে ওই কাশা ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে পড়েছিলাম।

'হুঁ, ব্যাপারটা বেশ গড়বড়ে', বলে একটিপ নাস্য নিল তপনদা, 'নৌকো তিনটে এ পথ দিয়ে কতক্ষণ আগে গেছে ?'

'ঘণ্টাখানেক তো হবেই।'

'জোরে হাত চালাও মাঝি' তমিজদ্দি চেঁচাল, 'কে জানে, বাপ আমার এখনো বেঁচে আছে কিনা।'

'না, আর এগুনো ঠিক হবে না। আমরা এখানেই নামব', জোর দিয়ে বলল তপনদা, 'যদ্দুর মনে হচ্ছে ছিপ নৌকো তিনটে বাচ্চু ডাকাতের—'

'বাচ্চু ডাকাত! সে এদিকে আসবে কেন?'—অবিনাশকাকা বললেন।

'হয়ত গুপ্তধনের খোঁজে।'

'গুপ্তধনের খবর সে জানবে কোত্থেকে?'—এবারের প্রশ্নটা আমার।

'সেটাও একটা রহস্য। মনে হচ্ছে—একটু পরেই তা জানতে পারব।'—তপনদার কথা শেষ হতে না হতেই 'বাঁচাও বাঁচাও' শব্দে বুক ফ টা চেঁচিয়ে উঠল সমশের। তারপর ঝুপ করে একটা শব্দ।

ব্যাপার কি! একটা কুমীর আচমকা জোরে হাল ধরে ঝাঁকাতে বেসামাল হয়ে কাড়াল থেকে সমশের জলে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লগি হাতে নিতাই আর আবদুল এগিয়ে গেল। ওদিক থেকে এল জনের নৌকার মাঝি। জলে পড়ে সমশের প্রাণপণে হাল ধরে আছে। পর পর লগির ঘা পড়তে বেগতিক দেখে মস্ত কুমীরটা সমশেরকে ছেড়ে জলের তলায় ডুব দিল।

নিতাই আর আবদুল ডিঙিতে চেপে ওকে তুলে পানসীতে নিয়ে এল। সমশেরের ডান হাতের কনুইয়ের কাছ থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছিল। আমি বলে উঠলাম, 'ঠিক হয়েছে। এই হল বিশ্বাস-ঘাতকের উপযুক্ত শাস্তি।'

'সাবাস নিরু। তুইও তাহলে বুঝতে পেরেছিলি—নৌকোয় কে আমাদের শত্রুপক্ষের লোক।' —তপনদার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তার মানে?'—বিরক্তির সঙ্গে বললেন অবিনাশ কাকা।

'মাদারদহ থেকে পানসী ছাড়বার পর থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করছি। কেবলই এটা ওটা ছুতো করে সমশের নৌকা থামাচ্ছিল। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ওর কোন বদ মতলব আছে।'—আমি জবাবে বললাম।

'ঠিক বলেছ তুমি', জন মাথা নাড়ল, 'সকালবেলা ডুমুরখালিতে আপনারা নদীর পাড়ে পৌছুবার আগে আমি দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম ব্যাটা পঞ্চাননের সঙ্গে গুজগুজ করছে।'

সমশের তখন লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে। সে কুঁইকুঁই করে উঠল, 'এবারের মত আমাকে ক্ষমা করে দিন বাবুমশাইরা।'

'ক্ষমা!'—গর্জে উঠল তমিজদ্দি। তপনদার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল, 'বেইমান কাঁহাকা! আমি আজ তোকে শেষ করব—'

আবদুল হাউমাউ করে কেঁদে তপনদার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার বাপকে মেরো না তোমরা। আল্লার দোহাই।'

অবিনাশকাকা রাগত গলায় বললেন, 'করো কি তমিজ। এ সময় মাথা গরম করলে চলে!'

আবদুলের দিকে তাকিয়ে আমার মন গলে গেল। বললাম, 'বেইমানির শাস্তি যখন ও হাতেনাতে পেয়েই গেছে তখন আর মার-ধোর করে লাভ কি।'

'ওরা ঠিকই বলেছে। সমশেরকে এ যাত্রা ছেড়ে দাও বাউলে। তাছাড়া সামনে বিপদ। বেশি হইচই করলে বাচ্চু ডাকাত যদি টের পেয়ে যায় যে আমরা এখানে এসেছি, তাহলে আর রক্ষে নেই।'—বুঝলাম—আমার মত তপনদাও আবদুলের উপর সদয়। এ কদিনের ভেতরেই ছেলেটার উপর মায়া পড়ে গিয়েছিল আমাদের। আবদুলের দৌলতেই সমশের মারধোরের হাত থেকে রেহাই পেল।

হাতে সময় নেই। জনের নৌকায় চিঁড়ে ছিল। ভিজিয়ে তাতে মধু মাখিয়ে খিদে মেটালাম।

এবারের দলটা বেশ ভারী হল। জন আর অবিনাশকাকাও

আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। মোট পাঁচ জন ডাঙায় উঠে তমিজদ্দি বলল, 'সমশের, ফের নেমকহারামি করবে না তো?'

অভয় দিল জন, 'সে ভয় আর নেই। ব্যাটার ডান হাতটাই জখম। হাল ধরবে কি করে। তাছাড়া আমার নৌকোয় মাঝি আছে না। ওকে হুঁশিয়ার থাকতে বলেছি।'

সবার আগে তমিজদ্দি। কি গহীন বন। বড় বড় গাছের ডাল-পালা আর ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো নিচে এসে পড়ে না। চারিদিক ছায়া ছায়া। হাঁটতে গিয়ে চটচট শব্দ হচ্ছে। এটেল মাটি পা টেনে ধরতে চায়। দুধারে হরগোজা কাঁটা গাছের ঝোপ। মাঝে মাঝে গিলেলতার ঝাড় পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বিরাট বিরাট লতা। সেগুলো আবার ময়াল সাপের মত মোটা মোটা।

জলকাদা ঝোপঝাড় ভেঙে এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ এগুনোর পর বন পাতলা হয়ে এল। শেষে ফাঁকায় এসে পড়লাম। সামনে শটি-গাছের জঙ্গল। সেদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় তমিজদ্দি বলল, 'দেখুন বাবুমশাইরা, ওই যে—'

তাকিয়ে দেখি—সামনেই একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কি ভয়ানক। পিঠে কয়েকটা গুলির দাগ। তখনও রক্ত বেরুচ্ছে। জন ছুটে গিয়ে লোকটাকে চিৎ করে ফেলতে আঁতকে উঠলাম। এ-কি, এ যে দেখছি পঞ্চানন মণ্ডল।

কাছাকাছি কোন এক জায়গা থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছিল। তমিজদ্দি বাঁ-দিকে এগিয়ে গেল। আমরা ওর পেছু নিলাম। এক সময় দেখলাম—একটা গেঁয়ো গাছের সঙ্গে লতা দিয়ে বুড়ো মতন একজনকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

'বাপজান, তুমি!'—চেঁচিয়ে উঠল তমিজদ্দি।

'কে, কলি বাউল—গলার স্বর কেঁপে গেল তপনদার।

বাঁধন খুলে দিতে চিঁ চিঁ করে বলল কলিমদ্দি, 'ডাকাতরা পঞ্চানন

আর সাগরেদদের গুলি করে মেরে আমাকে এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেছে।'

'তোমাকে কিছু করল না ওরা ?'—অবিনাশ কাকা প্রশ্ন করলেন।

'না, বাউলেদের জানে মারে না ডাকাতরা।'—তমিজদ্দি বাবার হয়ে জবাব দিল।

'বাচ্চু ডাকাত কোনদিকে গেছে কলিমদ্দি ?'—তপনদা শুধোল।

দূরে এক ঝাঁক বনঝাউয়ের জটলা। সেদিকে হাত তুলে বলল কলিমদ্দি, 'ওদিক পানে।'

নিঃশব্দে আমরা পা টিপে টিপে এগুতে লাগলাম। বুকের ভেতর কেউ হাতুড়ির ঘা মারছিল যেন। ঝাউয়ের জঙ্গল ছাড়াতে বেশ অনেকটা ঢালু জমি। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'বাচ্চু ডাকাতের পেছনে ছুটে আমাদের লাভ কি। আসলে যার জন্যে এত দূরে এলাম সেই ছোটকাকেই যদি খুঁজে পাওয়া না যায়।'

'আঃ, তোর বকবকানি থামাবি নিরু।'—ধমকে আমাকে চুপ করিয়ে দিল তপনদা। ঢালু জমির পরেই জল ভর্তি এক গভীর পরিখা। পরিখার ওধারে মস্ত এক দুর্গ। দুর্গের সিংহ দরজার দুধারে দুটো উঁচু বুরুজ। বুরুজের দুদিকে ধসে পড়া পাঁচিলে নানা রকমের গাছলতা গজিয়ে উঠেছে। খোলা দরজা, লোহার মরচে ধরা—। তার দু'-পাশে দুটো পুরোণ আমলের বিরাট কামান বসানো।

দুর্গে পৌঁছুবার ব্যবস্থা বাচ্চু ডাকাতই করে রেখেছিল। কয়েকটা বাইন গাছের মোটা ডাল কেটে পরিখার ওপর ফেলে সাঁকো তৈরি করে ভেতরে ঢুকেছে ওরা। আমরা সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে পরিখা পেরিয়ে দুর্গ-দ্বারে এসে পৌঁছুলাম। সিংহদরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে সামনে বিরাট এক বাঁধানো চত্বর। চৌকো আকারের। বুঝলাম—এক সময় এটা ছিল সৈন্য দলের ছাউনি। বাঁ-দিকে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি, তারপর একটা উঁচু মাটির ঢিবি। ওই বাড়িটা গোলাঘর। আর ঢিবিটা ছিল চাঁদমারি।

বাঁদিকে একটা ছোট স্তম্ভ মতন! তাতে পাথরের ওপর খোদাই করা রোমান হরফে লেখা কতগুলি অক্ষর। ভাষা পর্তুগীজ। তপনদা পড়ে বলল, "দুর্গটার নাম 'ম্যানোয়াল দ্য ম্যাটোস।' নামটা ইতিহাস বইতে পড়েছি। ম্যাটোস ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক বিখ্যাত হার্মাদ নৌ-সেনাপতি। তারই সেনাবাহিনীর এক যোদ্ধা ফ্রান্সিস-ডি-সুজা ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ তৈরি করে।"

তমিজদ্দি বলল, 'আস্তে কথা বলুন বাবু। দেখছেন না, চাতালে কাদামাখা পায়ের ছাপ। একটু আগেই ডাকাতরা ওদিকে গেছে।'

'ওদিকে কোথায়?'—শুধোল তপনদা। 'আসুন না। ভেতরে যাবার পথ আছে।' —বলে পা বাড়াল তমিজদ্দি।

চত্বর পেরোতে বিরাট প্রাসাদ। মস্ত এক ধ্বংসস্তূপও বলা যেতে পারে। তার মাঝখানে গুহার মত একটা পথ। আমরা তার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঘুবঘুট্টি অন্ধকার। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কিছুক্ষণ অন্ধের মত চলবার পর আলোর রেখা দেখা গেল। আর সেই সঙ্গে ঘট ঘট ঘটাং একটা বিকট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

গুহাপথের মুখে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাইরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সামনে টানা বারান্দা। বড় বড় খিলান। বারান্দার পর আবার অনেকটা বাঁধানো জায়গা। জায়গাটুকুর চারদিক ঘিরেই বাড়ি। বুঝলাম—এটা ছিল অন্দরমহল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তার উল্টোদিকে চত্বর ছাড়িয়ে বাড়ির একদিক ধ্বসে গেছে! তার পেছনে ভাঙা পাঁচিল। পাঁচিলের এক জায়গায় বড় একটা ফাটল।

বাঁধানো জায়গার ডানদিকে একটা ঘর। ঘরের অর্ধেকের বেশি মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। চত্বর থেকে কোমর অব্দি উঁচু সেই ঘরের ছাদে জনাচারেক ষণ্ডামার্কা লোক। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তার মাঝখানে ছোটকা দাঁড়িয়ে। ছোটকা ওদের সঙ্গে এখানে কেন। লোকগুলোর সকলের কাঁধেই বন্দুক

ঝোলানো। বড় বড় শাবল দিয়ে ওরা ছাদটা ফাটাবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম—ওরা বাচ্চু ডাকাতের দল। তবে কি ছোটকাকে বাচ্চু ডাকাত ধরে নিয়ে এসেছে! ভয়ে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকার গুহাপথের মুখে জড়ো হয়েছি বলে ওরা দেখতে পাচ্ছিল না আমাদের। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড আওয়াজ। চমকে উঠলাম। শাবল চালাতে চালাতে এক সময় আচমকা ছাদের মাঝখানটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। চোখের পলক ফেলবার আগেই ছোটকা সমেত লোক চারটাকে দেখতে পেলাম না।

আর কি স্থির হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। ঘরটার দিকে ছুট লাগালাম। কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকাতে চক্ষুস্থির। ঘরটা একটা বিরাট চৌবাচ্চার মত। তার অনেক নিচে বড় বড় ঘড়ায় ভর্তি মোহর আর সোনা-রূপোর গয়না। ডাকাতগুলো ঘড়ার ওপর গিয়ে পড়েছে। তাদের সাড়া পেয়ে ঘরের দেয়ালের ফাঁকফোকর থেকে বেরিয়ে আসছে বিষাক্ত সাপের দল। ছোটকা নিচে পড়েনি। ছাদের মাঝখানে থাকায় লোহার নড়বড়ে বরগাটা ধরে ঝুলছে কোনমতে।

সবাই এসে জড়ো হল ঘরটার কাছে। তমিজদ্দি বল, 'গত বছর আমরা এই ছাদের ফোকর দিয়েই গুপ্তধন দেখতে পেয়েছিলাম—'

ছোটকা আমাদের দেখে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, বাঁচাও আমাকে—

কেউ ছাদে উঠতে সাহস করছে না যদি বাদবাকিটুকুও ভেঙে পড়ে যায়। জন এগিয়ে বরগার একদিকে পা রাখতে সেটা শব্দ করে কিছুটা নিচের দিকে নেমে গেল। আর একটু নামলেই ডাকাতের দল ছোটকার পা ধরে ফেলবে।

'এভাবে হবে না। দাঁড়ান গোরাবাবু—' বলেই তমিজদ্দি প্রাসাদের গা বেয়ে লতিয়ে ওঠা একটা মোটা বুনো লতা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল।

এমন সময় আরেক বিপদ। হঠাৎ কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে কে যেন বাজখাই গলায় বলে উঠল, 'বন্দুক ফেলে দাও। কেউ এক-চুল নড়বে না। নড়লেই গুলি করব।'

মুখ তুলে তাকাতে দেখি ভাঙা পাঁচিলের ওপর একটা লোক দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে বন্দুক বাগিয়ে আছে। বিরাট শরীর। মুখ-ভর্তি গোঁফদাড়ি। ঢালের মত বুক। ইয়া মোটা হাতের কব্জি। ছোটখাট একটা দৈত্য যেন। বুঝলাম—ওই বাচ্চু ডাকাত। লোক-জনের সাড়া পেয়েই হয়ত ও ওখানে লুকিয়েছিল।

জন আর তপনদা বন্দুক ফেলে দিল। আমরা সবাই স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে গেছি। কড় কড় কড়াৎ। বরগাটা আবার নড়ে উঠে সশব্দে নিচের দিকে খানিকটা নেমে গেল। আর কিছুটা নামলেই ছোটকা মৃত্যুর অতল গহ্বরে পৌঁছে যাবে।

বাচ্চু ডাকাত হাঁটু ভেঙে সামনের দিকে ঝুঁকল। লাফিয়ে এদিকে নেমে আসার জন্য ও তৈরি হচ্ছে। এমন সময় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। রাখে কৃষ্ণ মারে কে। হঠাৎ ভয়ংকর এক গর্জন। ভাঙা পাঁচিলের ওধার থেকে একটা বাঘ লাফ মেরে উঠে এসে বাচ্চু-ডাকাতের টুঁটি চেপে ধরল। তারপর দুজনেই অদৃশ্য। ধপাস করে একটা শব্দ। বাচ্চু ডাকাতকে নিয়ে বাঘ পাঁচিলের ওধারে পড়েছে।

'এই সুযোগ বাউলে। চটপট শুভবাবুকে তোলার ব্যবস্থা করো।' —বলল জন।

তমিজদ্দি প্রাণপণ শক্তিতে টান মেরে লতাটাকে নামাল। তার-পর সেটার একদিক ধরতে বলল জনকে। দুজন ঘরের দুদিকে চলে গেল। তারপর আড়াআড়িভাবে লতাটা ছাদে নামিয়ে দিল। তপনদা গলার স্বর চড়িয়ে বলে উঠল, লতাটা ধরবার চেষ্টা কর শুভ। পাঁচিলের ওধারে তখন জোর ধস্তাধস্তি চলছে। ছোটকা অনেক কষ্টে ধরে ফেলল। জন আর তমিজদ্দি শক্ত হাতে দুদিকে ধরে রেখেছে। বরগাটা সশব্দে ফের খানিকটা নিচে নেমে গেল। তাতে ফল ভালই

হল। বরগাটায় পা রেখে লতাটা ধরে এগুতে লাগল ছোটকা। অবিনাশকাকা উৎসাহ দিতে লাগলেন 'সাবাস শুভ, আর একটু এগিয়ে এসো—

অবশেষে তপনদা আর আমি ঝুঁকে ছোটকার একটা হাত ধরে ফেললাম। তারপর টেনে হিঁচড়ে ওকে কার্নিশের দিকে নিয়ে আসতে বরগাশুদ্ধু গোটা ছাদটাই হুড়মুড় করে নিচের দিকে নেমে গেল।

চাতালে উঠে এসে ছোটকা অবিনাশকাকাকে দুহাতে জাপটে ধরল। সে কাঁপছিল থরথর করে। ওধারে তমিজদ্দি লতা ছেড়ে দিয়ে একটা বন্দুক তুলে নিয়ে ভাঙা পাঁচিলের দিকে ছুটল। তপনদা বলল 'তুমি আবার কোথায় চললে?'

'এখুনি আসছি'—বলেই ফাটলের ভেতর দিয়ে তমিজদ্দি পাঁচিলের ওধারে চলে গেল।

জন শুধোল 'আপনি বাচ্চু ডাকাতের হাতে গিয়ে পড়লেন কিভাবে?'

ছোটকা হাঁপাচ্ছিল। অনেক কষ্টে বলল, 'নৌকা করে বঙ্গদুনির দিকে আসছিলাম। হঠাৎ মায়াদ্বীপের কাছাকাছি ওরা আমাকে ধরে ফেলল।'

'সে তো অনেক দিন আগেব কথা। এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে?'—তপনদা বলল।

'ওরা টাকা পয়সা হাতঘড়ি কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল না আমাকে। বাচ্চু ডাকাতের সন্দেহ হল—আমি নিশ্চয়ই কোন মতলবে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাই আটকে রাখল।'

'তারপর—?'

'তারপর আর কি। আমি কিছুতেই গুপ্তধনের কথা বলব না, ওরাও ছাড়বে না। শেষে দারুণ মারধোর করায় বলতে বাধ্য হলাম।'

কলি বাউলে হঠাৎ কঁকিয়ে বলে উঠল, 'একি, তমিজ এখনো ফিরছে না কেন!'

সত্যিই তো। তমিজদ্দির কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। কলি বাউলের কথা শুনে জন ভাঙা পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল। তপনদা বলল, 'না জন, আপনি একা যাবেন না। সুন্দরবনের বাঘ, মারাত্মক। আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।'

ফাটল দিয়ে আমরা একে একে সবাই পাঁচিলের ওধারে চলে গেলাম। সামনেই আবার পরিখা। এটা দুর্গের পেছন দিক। বাচ্চু ডাকাত, তমিজদ্দি, বাঘ—কাউকেই দেখতে পেলাম না। রক্তের দাগ দেখে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুটা পথ এভাবে চলার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনের দিকে পথটা চলতে চলতে আচমকা এক জায়গায় খাদের মত নেমে গেছে। নিচে বিরাট ঢালু জমি। সেই জমির এক কোণায় একটা ধুঁধুল গাছের নিচে বাঘটা বসে। ওর সামনে বাচ্চু ডাকাতের লাশ। তার থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা বেতঝোপের আড়ালে তমিজদ্দি দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক বাগিয়ে।

অদ্ভুত বাঘ। আগে কখনো দেখিনি। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে অল্প ছোট হবে। গায়ে হলুদের ওপর ডোরা নয়, কালো গোল দাগ। অবাক হয়ে গেলাম। আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরে জন ফিস্ ফিস্ করে বলল, একে বলে গুলবাঘ। ভীষণ হিংস্র। সুন্দরবনে মাঝে মধ্যে এদের দেখা যায়।'

হঠাৎ ধমকের সুরে তমিজদ্দি মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বাচ্চু ডাকাতের লাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর তমিজদ্দির দিকে মুখ ফেরাল। বন্দুক তাগ করল বাউলে। কি সাহস ওর।

গুডুম। গুডুম। তমিজদ্দির বন্দুক গর্জে উঠল। গুলি মোক্ষম জায়গায় লেগেছে। একেবারে মাথায়। রক্তে বাঘটার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। ঘর-ঘর আওয়াজ করে তেড়ে-ফুঁড়ে জানোয়ারটা বেত-ঝোপের দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু বেশি দূরে এগুতে পারল না।

মাঝপথে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

হৈ হৈ শব্দে বেত ঝোপের কাছ থেকে বাঘটার দিকে ছুটে গেল তমিজদ্দি। তারপর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে জানোয়ারটার মাথায় পাগলের মত ঘা মারতে লাগল।

আমরা লাফিয়ে ঢালু জমিতে নেমে পড়লাম। কুঁদোর ঘায়ে বাঘের দফা শেষ। মাথা ফেটে চৌচির। ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে। তমিজদ্দির রাগ পড়তেই চায় না। অনেক কষ্টে শান্ত করলাম। ও বলল, 'আপনারা জানেন না বাবুমশাইরা। এই ব্যাটাই আমার দাদা জয়নদ্দিকে মেরেছিল—'

এবার ফেরার পালা। ইতিহাস-বিশারদ তপনদা বলল, 'আমরা আর ভেতরে ঢুকব না। প্রত্যেক দুর্গে পেছনেই পালাবার জন্য একটা করে গুপ্তপথ থাকে। এই পরিখাই হল সেই পথ। এ পথ ধরে হাঁটলে নিশ্চয়ই আমরা নদীর ধারে পৌঁছে যাব।'

তপনদার কথায় সকলেই সায় জানাল। আমরা তখন ভীষণ ক্লান্ত।

ভাঙা পাঁচিলের ওধারে তখন গোঙানী গুমরে গুমরে উঠছে। গুপ্তধনের সঙ্গে চিরকালের জন্য চাপা পড়ে গেছে হতভাগ্য লোভী ডাকাতের দল।

ছোটকার শরীর অবসন্ন। হাঁটতে পারছিল না। জোয়ান মানুষ জন। সে বলল, 'কুছ পরোয়া নেহি। আমি শুভবাবুকে কাঁধে নিচ্ছি—'

তপনদার কথাই ঠিক। পরিখার পাড় ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা খালের মুখে এসে পড়লাম। প্রথমেই জনের নৌকাটা চোখে পড়ল।

খাল থেকে পানসী এসে গোসাবা নদীতে পড়ল। ছোট্ট করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল ছোটকা, 'গুপ্তধনের কাছে গিয়েও খালি হাতে ফিরে আসতে হল—'

সান্ত্বনার সুরে অবিনাশ কাকা বললেন, 'এ-ই ভাল হল। তুমি

তো জানো শুভ—ওই ধনদৌলতের সঙ্গে কতশত মানুষের চোখের জল মিশে আছে। তাছাড়া দুঃখই বা করছ কেন। সুন্দরবনে এসে আমাদের কি কম লাভ হয়েছে। কত অভিজ্ঞতা হল। এ তো রত্ন পাবার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান—'

জন বলল, 'লোকজন জোগাড় করে আবার একবার আসতে হবে। কিছুই ভাল করে দেখা হল না—'

তপনদার আফশোস একটাই। তাড়াহুড়ো করে আসায় বাড়ি থেকে ক্যামেরাটা সঙ্গে করে আনতে ভুলে গিয়েছিল। কতকিছু দেখা হল। অথচ কোন সাক্ষ্যই নিয়ে যেতে পারল না সে।

কলকল শব্দে জোয়ার আসছে। নিতাই পাল খাটিয়ে দিল। সামনে নদী বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরে বিরাট গম্বুজের মত সোনার চাদরে মোড়া আকাশ। স্রোতের মুখে উত্তরদিকে তরতর করে পানসী ছুটছে।

ওদের কথাবার্তায় মন নেই আমার। সেই কবে শিয়ালদা' থেকে ট্রেনে চেপেছিলাম। তারপর কতদিন হয়ে গেল এই অভিশপ্ত সুন্দর-বনের নদী-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর ভাল লাগছে না। দূর নদী-বাঁকের দিকে তাকিয়ে আমি তখন শুধু একটা কথাই ভাবছিলাম —আবার কবে কত তাড়াতাড়ি আমি আমার প্রিয় কলকাতায় পৌছুতে পারব। পরিচিত পরিজনদের মুখ দেখতে পাব।